Joyshil

Gargi Bhattacharya

****

COPYRIGHTED

MATERIAL

জয়শীল

গার্গী ভট্টাচার্য

স্যারেদের,

যাঁরা অক্ষর শিখায়

পুড়িয়েছেন !

জয়শীল

বিদেশে সম্প্রতি মারা গেলেন জয়শীল । জয়শীল কর্মকার । বয়স হয়েছিলো মোটে- ষাট।

লম্বা , চওড়া চেহারা । সোনার মতন গায়ের রং ।

অসম্ভব বিনয়ী ও একই সঙ্গে লড়াকু এই ভারতের মানুষটি যেমন রূপবাণ ছিলেন সেরকম অন্তরেও ছিলেন স্নেহময় । লোকে খুবই পছন্দ করতো ওঁকে । বয়সের কারণে হার্টের ব্যামো হয়- আর মারা যান হঠাৎ-ই একদিন । হাসপাতালেও যাবার সময় পাননি ।

ভক্তরা ভেঙে পড়েছে । ষাট একটা বয়স হল ?

তাও বিদেশে ? জীবন শুরুই হয় ষাটে । অবসরের পর । যদিও জয়শীল সেই অর্থে অবসর নেননি কারণ উনি ছিলেন একজন পেশাদার লাইফ কোচ , তবুও ষাটে জীবন শুরু হয় এটা সবাই জানে ।

কাজেই লোকে খুবই আহত হয়েছে । যেই মানুষটির হাত ধরে আজ কতনা জন, জোয়ানা, ক্লিফ, প্যারি, মমতাজ, সঈফ, রশিদা , হামিদ , কেকা, প্রশান্ত , সুব্রাহ্মনিয়াম , নটরাজন্ আশার আলো দেখেছে , নতুন আলোয় ভেসেছে জীবনের ভাঙা তরীটি সাজিয়ে- সেই মানুষ নাকি দুনিয়া ত্যাগ করেছেন ! তাও রোগে ভুগলে কিছু সময় পাওয়া যায় চিকিৎসা করানোর অথবা শোকের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার কিন্তু এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত একেবারে !

সাত সকালে উঠে রেডিও, টিভি, এম এস এন, ইয়াহু সর্বত্র একটাই সংবাদ--- জয় কর্মা ইজ ডেড্ ।

জয়শীল কর্মকারকে এখানে সবাই জয় কর্মা বলেই ডাকে । লাইফ কোচের ভারি নাম । হয়ত এত নাম লাইফ কোচের হয়ই না ! রীতিমতন সেলিব্রিটি !! অসম্ভব রূপবাণ এই মানুষটি সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকেই- জীবনে আলো দেখিয়েছেন ।

নাম, ডাকওয়ালা মানুষ আর হতদরিদ্র মানুষ সবাই ওঁর কাছে ছিলো আদরের ।

নিজের বিশাল কর্মস্থল , বৈশালী ।

এটা একটা রিসর্ট । এই রিসর্টে দলে দলে লোকে আসে আর জয়শীলের সাথে কিছুদিন থাকে । এখানে মানুষের দিন শুরু হয় ধ্যান দিয়ে । যোগা দিয়ে । পরে কোচিং , কাউন্সেলিং আর দিনশেষে নির্ভেজাল আড্ডা হয় । নিরামিষ খেলেই ভালো যারা একেবারেই অক্ষম তাদের অল্প অল্প করে আমিষ ছাড়তে শেখানো হয় ।

নিরামিষ খেলে দেহ ভালো থাকে । গ্রেন্স্, ভেজিটেবেল , ফলমূল আর অজস্র নির্মল জলপান ।

টক্সিক জিনিস বেরিয়ে যায় ।

বেশিরভাগ মানুষই নিরামিষ খায় বৈশালীতে এসে !

স্থানমাহাত্ম্য বলেনা ? সেই ব্যাপারটি দেখা যায় এখানে । লাইফ কোচের কাজ জীবনের রুক্ষ পথে মানুষকে ; মসৃণভাবে এগিয়ে দেওয়া । সাবলীল উপায়ে পথ চলতে শেখানো । নৌকোর দাঁড় টানতে শেখানো ।

বহু পথভোলা মানুষ এই বৈশালীতে এসে নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে । বহু আত্মহত্যা করতে উদ্যত হওয়া চেতনা এখানে এসে ভুলেছে দু:খ ।

এখানে সপ্তাহে একটা ক্লাস হয় যার নাম উইক্লি মিরর্ । সেখানে মানুষ নিজের মনের সব কথা লেখে । যা ইচ্ছে । গালিগালাজ , রাগ , কটূভাষণ , আজেবাজে চিত্র অঙ্কন । যা ইচ্ছে । মনের সব ভেজাল বার করে দেওয়া হয় । সেই ডাইরি ; শিক্ষক মানে জয়শীলকে দেখানো হয় । লজ্জা পাবার কিছু নেই । মনকে আয়না করতে হবে । আর কাঁচের কাজ করতে গেলে হাতও কাটবে আর ঝনঝন্ শব্দও হবে । কাজেই এখানে কেউ কিছু মনে করেনা উদ্ভট সেইসব রচনা ও চিত্র দেখে ।

বেশিরভাগ মানুষই অশ্লীল চিত্র আঁকে আর বাজে জিনিস লেখে । মানুষের মনে রাগ, হিংসা ও কাম একত্রে বাস করে । দেখা যায় নিজেদের সবাই দেবদূত মনে করে । মুখোশে ঢেকে রাখে সব । কিন্তু ল্যাংটা হবার সুযোগ দিলে , সমাজের সবাই দুইহাতে চোখ ঢেকে রাখার প্রতিজ্ঞা করলে আসল রূপ বেরিয়ে পড়ে । এগুলি চেপে রেখে রেখে , নকলকে আসল করার প্রয়াসে ডুবে গিয়েই শুরু হয় মনোবিকৃতি ।

তারপর বদ্ধ পাগল অথবা হেরে যাওয়া চূর্ণবিচূর্ণ এক অস্তিত্ব । বৈশালীতে যোগা, ভালো খাদ্য আর অঢেল

স্বাধীনতা দিয়ে মনকে , আয়না করার কাজে লাগানো হয় । লাইফ কোচ হিসেবে খ্যাতি পাওয়া জয়শীল কর্মকার এগুলি করেন ।

যাঁর নামই জয়শীল, তাঁর কর্ম যে নতুন কিছুর রূপকার হবে আর সর্বদা জয় লাভ করবে তা আর বলে দেবার অপেক্ষা রাখেনা । **কাজেই বৈশালী ; বাহুবলী টুয়ের থেকেও বড় হিট্ !**

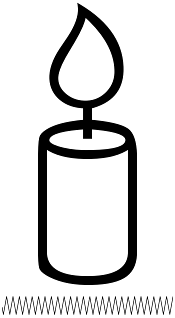

আসলে লাইফ কোচ, জয়শীল একদিনে হননি ।

ভারত থেকে যখন এখানে আসেন , তখন উনি একজন ছাত্র ছিলেন । সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে একটি স্কলারশিপ্ পেয়ে ভারতের মোম্হাট গ্রাম থেকে এখানে আসেন । পড়তে । মোম্হাটে ওঁর বিরাট সম্পত্তি ছিলো । আগে পরিবারের লোক লোহার কাজ করতো । পরে তারা স্বর্ণকারের কাজে যুক্ত হয় । ধীরে ধীরে গহনা বানানোতে ঢুকে পড়ে । সোনার গহনা বানাতে গেলে নাকি নানান জাতের রসায়নের

মোকাবিলা করতে হয় । সেগুলি সবই বংশ পরম্পরায় শিখে নিয়েছিলো জয়ের পরিবার ।

আস্তে আস্তে তারা গ্রামের ধনীদের মধ্যে চলে আসে ।

তবে কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ বংশ না হওয়ায় ওদের সেরকম ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো না কেউ । ঐ ধনী বলে যা রেয়াৎ করতো লোকে । **নাহলে মান-সম্মান সেরকম পেতোনা ওরা ।**

পরে জয়শীল পড়াশোনা করার জন্য শহরে যান এবং ভালো ছাত্র হিসেবে বিদেশে চলে আসেন ।

বিদেশে আসার আগে অবশ্যই বিয়ে হয়ে যায় তার ।

আসলে শহরে বি-এ পড়তে যাবার আগেই বিয়ে হয়ে যায় বংশের পছন্দ করা মেয়ের সাথে ।

নাম তার নয়ন । নয়নদের পদবী হল সাহা !

ওরাও মোম্‌হাটের বাসিন্দা । বহু যুগ ধরেই । ওদের পরিবারের মধ্যে কেউ বৃটিশ যুগে, নীলচাষের সাথে যুক্ত ছিলো । পরে সাহেবদের চাম্‌চাগিরি করে অনেক ধনসম্পদ হাসিল করে । ওদের বাড়ির মেয়েদের তিন কিংবা চার বছরেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় ।

পরে দেহে যৌবন ঢললে- তাকে বরের কাছে পাঠানো হয় ।

এদের বংশে মেয়েদের, পুতুল সাজিয়ে রাখে ।

মেয়েদের পাহারা দেবার জন্য লেঠেলও রাখে ওরা ।

ওদের বংশের এক মেয়ে, নয়ন সাহার সাথে বিয়ে হয় জয়শীলের । জয়শীলও তখন কিশোর বলা চলে ।

নাবালক । হাইস্কুলে যান ।

নয়নের বয়স যখন নয়- তখনই তার বিবাহ সম্পন্ন হয় জয়ের সাথে । কারণ সে স্কুলে যেতো । ক্লাস ফোরে পড়তে বিয়ে হয় জয়ের সাথে । তার আবার পিরিয়ড হয় মাত্র ছয় বছর বয়সে । কাজেই বিয়ের পরে স্বামীর সাথেই ছিলো মেয়েটি । নয়নের ব্যবসাদার বাবা তার তিন মেয়েকেই স্কুলে ভর্তি করেন ।

নয়ন সবার বড় । অন্য দুজন কাঞ্চন আর দোলন ।

তাদের আরো কম বয়সে বিয়ে হয় কারণ নয়ন বিয়ে করবে না বলে লুকিয়ে ছিলো দূরের এক দিঘীর পাড়ে ; এক ভাঙা মহলের এক কোণায় । কিছুতেই সে

বিয়ে করবে না। জয়শীলকে সেও চেনে কিন্তু এত কম বয়সে বিয়ে না করে সে লেখাপড়া করতে চায়।

তাদের বাসায় খুব যাত্রা , নাটক , সিনেমা দেখার চল ছিলো । সেখানে দেখা যেতো মেয়েরা কত এগিয়ে যাচ্ছে । আর নয়ন মাত্র চার বছরে বৌ হয়ে, ঘরের কাজে যুক্ত হচ্ছে এরকম তার মাও চাইতেন না।

তাই নয় বছর বয়সে বিয়ে হয় । ওদের সমাজের হিসেবে মেয়ে বুড়ি হয়ে গেছে ততক্ষণে । লেট ম্যারেজ।

যৌথ জীবনে নয়ন -জয়শীলকে চেনার অনেক আগেই উনি শহরে পড়তে যান। পরে প্রবাসে চলে আসেন।

নয়নের সাথে দেখা হতনা তবে বাবার চিঠিতে ওর সম্পর্কে লেখা থাকতো। ওর ফটো পর্যন্ত আসতো।

ওকে দেখতে সিনেমার অভিনেত্রীর মতন । তবে রং চাপা । শহরে অনেকেই বলতো :: **কোন ফিল্মস্টারকে বিয়ে করেছো বাপু বলো তো হে !**

দেখতে যতই ভালো হোক্ , তার স্ত্রী মূর্খ । কাজেই সারাজীবন ওকে নিয়ে কাটানোর অর্থ হল ঝিয়ের সাথে

থাকা । এরকমই মনে হত জয়ের । তাই আস্তে আস্তে সম্পর্ক কেটেই দিলেন । বিদেশে আসার সময় পাসপোর্টে লিখলেন যে **উনি অবিবাহিত । ওঁর কোনো মিসেস নেই ।**

সুদূর মোম্‌হাট গ্রামের কেউ এসব জানলো না । তারা সবাই শুনলো যে কর্মকার কুটিরের একটি ছেলে বিদেশে গেছে , বৃত্তি নিয়ে- উচ্চশিক্ষা নিতে । কাজেই সবার বুক গর্বে ভরে উঠলো ।

কেবল বুদ্ধিমান, স্কুলের মাস্টার- পাঁচুগোপাল দত্ত দৌড়ে গিয়ে নয়নের বাবাকে জানালো যে জামাই বিদেশে গেছে কিন্তু মেয়েকে নেয়নি আর দেখতেও আসেনি যাবার আগে এতে যেন **সাহাকূলের সূর্য নয়নের বাবা** সতর্ক হয় । শহর ভালো জায়গা নয় । ওখানে আকাশে বাতাসে, ছলনা রাজত্ব করে । লোভ, পাপ ও হিংসা প্রতি গলির মোড়ে । কাজেই সাহাবাবু যেন খুঁজে বার করেন জামাইয়ের নতুন ঠিকানা । যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি ।

নয়নের বাবা তখন- কাঞ্চনের বিয়ে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে খোঁজ নিতে দেরি হয়েই গেলো ।

নয়নের মতন কাঞ্চনের বরের গৃহ -এই গ্রামে নয় ।

অনেক দূরের এক গ্রামে । তারাও ধনী । জমিজমা আছে । চাষী পরিবার । সম্পন্ন পরিবার ।

কাজেই নয়নের স্বামী সম্পর্কে খবর নিতে অনেকটাই বিলম্ব হল । এর পরের মেয়ে দোলনের বিয়ে হবে কিছু বছর পরেই । কাজেই বাপের অনেক দায়িত্ব ।

নয়নের বরের বাড়ি, মোম্‌হাটের কর্মকার কুটির ।

দোতলা বিরাট মহল । বার মহল , অন্দর মহল আছে । চাকরের ঘর আলাদা ।

সেখানে গিয়ে জানা গেলো যে জামাইবাবাজী বহাল তবিয়তে আছেন আর বিদেশে লেখাপড়া করছেন । শেষ হলে বছর কয়েক পরেই আসবেন । ব্যস্ততার জন্য নয়নকে খবর দেওয়া হয়নি ।

তবে কর্মকার কর্ত্তা নিয়মিত নয়নের ছবি ও সংবাদ-তার পুত্রকে দিয়ে থাকেন ।

সেইসময়ের মত নয়নরা খুশি হলেও, এই টান বেশিদিন থাকেনি । ক্রমশ , জয় ভুলেছেন নয়নকে ।

তার ফিল্ম স্টার বৌকে । গ্রামীণ বধূ , রূপের জোরে শহুরে মানুষের স্বপ্নের ফিল্ম স্টার ।

গ্রেসি সিং এর মতন দেখতে । হট্, সেক্সি কিছু নয় । সনাতন ভারতীয় মেয়েদের মতন । লালিত্যে ভরা , আভিজাত্য মোড়া , সুন্দর একটি উপস্থিতি ।

যাকে দেখে কামের কামড় লাগেনা -----মন কাঠালিচাঁপা হয় । স্নিগ্ধ, সুগন্ধা হয় অবচেতন । শান্ত হয় মনভূমি ।

নয়ন কম কথা বলে । খুব সেলাই করতো । রং বেরং এর নক্শা করা কাপড় , সোয়েটার , টাই অ্যান্ড ডাই । বাটিক । লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি বলে খেঁজুড়ে আলাপে দিন কাটাবার মেয়ে সে নয় ; বোদ্ধারা বলে যে সুযোগ পেলে নয়ন সাহা একজন দূর্দান্ত আর্ট হিস্টোরিয়ান হতে পারতো । প্রাচীন সব আর্ট নিয়ে এত জ্ঞান লাভের ইচ্ছে তার । নিজের কিছু বিদেশী পুতুল ছিলো । দামী পুতুল সব । শহর থেকে আনা । সেইসব পুতুল , আগুনে পুড়িয়ে ফেলে নয়ন , কৈশোরে । কারণ তার মতে আমাদের দেশী পুতুলের সৌন্দর্য্য ও লালিত্য বিদেশিয়া পুতুলের চেয়ে -------

কোনো অংশে কম নয় । মেয়ের জেদের কাছে হার স্বীকার করে তার বাবা-মা ।

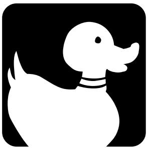

প্রথমে তার বাবা তাকে, চার বছরে বিয়ে দেবার প্ল্যান করেন । মায়ের রাজি না হওয়ায় সেটা পিছিয়ে সাত হয় । সাত থেকে নয়ন লুকিয়ে পড়ে ; বিয়ে করবে না বলে । অনেক মারধোর খেয়ে নয় বছরে বিয়ে করে । ওর পরের বোন কাঞ্চনের বিয়ে, ওদের বাবা কম বয়সেই দেন । হয়ত দোলনের বিয়েও খুব অল্প বয়সেই হবে । ততদিন ওরা স্কুলে যাবে ।

যদিও সমাজের চোখে , সাহাবাড়ির মেয়েগুলো বুড়োধাড়ি হলে তবেই বিয়ের পিঁড়িতে বসে ।

মেয়েদের দৈহিক গঠণ ও কলকব্জা এমনই যে বুড়ি হলে নানান সমস্যা । বিয়ে নাহলে ও সন্তান সময়ে নাহলে নানান অসুখ দেখা দেয় । কাজেই বিয়েটা কমবয়সে হওয়াই ভালো । কিন্তু সাহাবাড়ি ভিন্নমতের ।

বাপের সাহেবিয়ানা আর আশ্‌কারায় মেয়েগুলো নষ্টমেয়ে হতে চলেছে । একটার বর তো ওটাকে নেয়না ! সাহেবের দেশে পড়তে গেছে ওকে ফেলে !

আর কী ফিরবে ? মনে হয়না ।

এইসব কুৎসা লোকে, গ্রামের ঘরে ঘরে বসে করতো । তবে সাহাবাবু অথবা কর্মকার কুটিরের মানুষের তাতে বিন্দুমাত্র কিছু যেতো আসতো না ।

তারা পশ্চিমী ভাবধারায় বিশ্বাসী । মেয়েদের ওরা শিক্ষা দেয় । তারপর বিয়ে । আর ওরা বড়লোক ! পয়সা এমন বস্তু যা মানুষের মুখ কেন আত্মাও স্তব্ধ করে দিতে পারে । বাস্তব জগতে পয়সাই ঈশ্বর আবার দানবও বটে !!

বিদেশে এসে জয়শীল প্রথমে শান্ত থাকলেও, বন্ধু পাল্লায় পড়ে এখানকার মুক্ত সমাজের সমস্ত মন্দ দিকে ঝুঁকে পড়েন । লোককে পরবর্ত্তী জীবনে বলতেন যে উনি সবসময়ই একজন সিকার । সত্যান্বেষী । সত্যের উপাসক । তাই বিদেশে এসে প্রতিষ্ঠা পাবার পরে মনে হত--হোয়াট নেক্সট্ ? একদিন তো মরণের ফাঁদে সবাই পড়বে । এক জীবন সমস্ত আশা মেটানোর জন্য যথেষ্ট নয় আর সব পেয়ে গেলে তারপরে কিসের ভরসায় দিন কাটাবে ? তাই এখানে এসে ভারতের মানুষের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যের যে জিনিস তাই উপভোগ করে দেখার পথেই যান । সেক্স !!!

এরা এত সেক্স-কাতর যে বলার নয় । সত্তর বছরেও লোকে নিয়মিত আনন্দ নেয় । শয্যায় । সন্ন্যাস বলে কোনো কনসেপ্ট এদের যেন নেই । তাই ওটা পরখ করে দেখতে চেয়েছেন যে ঠিক কী আছে ঐ বন্ধ দরজার ওদিকটায় ।

একটা সেক্স ভিলেজেও গিয়ে থেকেছেন পাকা পাঁচ-ছয় বছর । সেখানে সবাই ইচ্ছেমতন সেক্স করে ।

সেক্স টয়েজ যেমন আছে সেরকম নকল মানবী ও মানবের সমাবেশও আছে । নিজের নানান ফ্যান্টাসি মেটাবার জন্য । নকল মানবীর যোনি অভিযান করতে হলেও কনডোম ব্যবহার করতে হয় । অসুখের ভয়ে ।

স্টেরিলাইজ্ করা থাকলেও । অ্যানাল সেক্স, একসাথে পাঁচ ছয়জন মিলে সেক্স করা , একই লিঙ্গের দুই মানুষের যৌন মিলন , পশুর সঙ্গে রতিক্রীয়া সমস্ত কিছুই ওখানে নিয়মিত হয় । সেক্স ডলস্ পাওয়া যায় । নিজের মনের গহীনে যত অভিযান করার বাসনা গোপন আছে সেগুলি সামনে নিয়ে আসা যায় এই গ্রামে ।

পশুদেরও সেক্সি ড্রেসে দেখা যায় ।

মেয়েরা ; বোরখার মতন পোশাকে আপাদমস্তক ঢাকা । কেবল পায়ের জয়নিং আর দুটি স্তন মুখ বার করে আছে । সেখানে একবিন্দু কাপড়ের আভাস নেই !

এই ভিলেজেই আছে ন্যুড্ বিচ্ । মেয়েদের ব্যবহৃত আন্ডার গার্মেন্ট পাওয়া যায় এখানে । অনেক **এটিএম** মেশিনের মতন মেশিন আছে । সেখানে বোতাম টিপে দিলেই ব্যবহৃত ব্রা, প্যান্টি , প্যাড বেরিয়ে আসে ।

পুরুষেরা হামড়ে পড়ে কিনে নেয় !

অনেকেই এখানে এসে সুস্থ হয়ে ফিরেছে । তারা আগে পার্ভার্ট ছিলো । অনেকে জয়কে এমনও বলেছে যে মেয়ে দেখলেই মনে হয়, স্তন দুটি ধরে ঝুলে পড়ি !

পরবর্ত্তী কালে তারাই এখান থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেছে । একজন আবার তার এলাকায় এরকম এক সংস্থা খুলেছে ।

সেই ভিলেজে অনেকটা সময় কাটিয়েছেন জয়শীল ।

ওখানে এক মেন্টর আছে । রব বলে সবাই । রবার্ট নাম তার । সে ঐ ভিলেজে যেসব শরণার্থী যায় তাদের সবাইকে সেক্স জয় করতে শেখায় ।

পার্ভার্ট হয়ে যায় নর্মাল মানুষ । গঠণমূলক কাজে যুক্ত হয় তারা । অপোজিট সেক্সকে শ্রদ্ধা করে । বিছানায় নিয়ে যেতে উদ্যত হয়না ।

মনকে কন্ট্রোল করতে শেখানো হয় ওখানে ।

জয়শীল-তাঁর সমস্ত সেক্স ওখানেই শেষ করে এসেছিলেন । নয়নের সাথে দৈহিক মিলন হলেও সন্তান হয়নি । মিলনও সেইভাবে সার্থক বলা চলেনা কারণ তার সময়কাল খুবই অল্প । ওরাও তখন দুজনেই সদ্য ফোটা কুঁড়ি । কাজেই পূর্ণতা লাভে হয়ত সেইভাবে সক্ষম হয়নি ওরা ।

সেক্স ভিলেজ কিন্তু জয়শীলকে প্রশান্তি ও পূর্ণতা দিয়েছে। আস্তে আস্তে ঐ অবৈধ অভ্যাস থেকে নিয়মে ফিরেছেন । সাথে চলেছিলো এন্তার সুরা ও হার্ড ড্রাগস্ । হয়ত এসবও জয় করে ফেলেছেন জয়শীল !

পরে অন্য মানুষকে সাহায্য করার জন্য বৈশালীর জন্ম । কিন্তু এখানে সেক্স ভিলেজের মতন যৌনতা নিয়ে কাজকারবার চলেনা । এখানে হোলিস্টিক ভাবে লাইফকে চালানোর শিক্ষা দেওয়া হয় ।

স্কুল, কলেজ , পরিবার আমাদের শিক্ষা, রোজগার আর সাংসারিক দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে । কিন্তু লাইফের নানান জটিল মূহুর্তে ঠিক কী জাতীয় কাজ করলে সুবিধে হবে বা সার্থক হবে জীবন সেই বিষয়ে কেউ শেখায় না । অনেকে অভিজ্ঞতা থেকে পরিপক্ক হয় । অনেকে হারিয়ে যায় অন্ধকারে । উপযুক্ত জীবনবোধ না থাকায় । লাইফ কোচ হিসেবে ঠিক সেই শুন্যস্থানই পূরণ করেন জয়শীল ।

সেক্স ম্যানিয়াক্ যেমন দিক্ খুঁজে পায় ঠিক সেইভাবেই একজন সৎ যুবকও খুঁজে নিতে পারে নিজের জীবনের সহজ পথ ;সমস্ত বক্র পথকে পাশ কাটিয়ে ।

কেন আমরা মানুষ এই দুনিয়ায় আসি , কেন পদচিহ্ন রেখে যেতে হয় , কেন মৃত্যু সবার ফাইনাল গোল

হলেও জীবনকে উপভোগ করতে হয় , কেন দূর্ভাগাদের সাহায্য করা উচিৎ তাতে মনের শান্তি ফিরে আসে , কখন নিকটজনকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে হয় নিজের স্বপ্ন পূরণের ইন্দ্রধনু ছুঁতে --- সবই উদাহরণ দিয়ে ও কেস্ স্টাডিজের মাধ্যমে মানুষের মাঝে মেলে ধরা হয় ।

জয়শীল এই বিষয়ে এক অথারিটি । বিভিন্ন কালচারের পজিটিভ দিক্ নিয়ে উনি নিজের মতন এক প্রথা তৈরি করেছেন যাকে উনি বলেন ইনার কোডিং ।

নিজেকে ডিজিট্যাল নয় ; মাংসাশী করতে এই কোডিং সবার শেখা জরুরি । নিজে সুস্থ হলে সংসার সুস্থ হবে । নিজে শান্তি পেলে ; পড়শীকেও শান্তি দেওয়া যাবে ।

লক্ষ কোটি মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়া এই বিচিত্র লাইফ কোচিং আজ জয়কে এত সম্মান দিয়েছে ।

তাঁর মৃত্যুর পর মনে হচ্ছে যেন নয়ন সাহা , তাঁর প্রথমা স্ত্রী নন বরং উনি নিজেই এক ফিল্ম স্টার ।

এত মানুষের ঢল নেমেছে, বৈশালী ফাউন্ডেশানের রিসর্ট আর তার আশেপাশে- যে এক্সট্রা পুলিশের সারি দেখা যাচ্ছে ।

এই বৈশালী কম্পাউন্ডে আবার অনেক ব্যাঘ্র ছানা ও বাঘনখের দেখা মেলে । বাঘবন্দী খেলায় কেউ মাতেনা । বাঘেরা উন্মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায় সর্বত্র ।

এরা নিরামিষ খায় । শৈশব থেকেই এখানে বড় হয় । প্রথমে জয়শীল যখন এখানে আসেন এই প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে তখন গোটাকতক ছানা ; সদ্য অনাথ হয়েছে । বনের কোনো হিংস্র মানব, তাদের মাকে মেরে ফেলেছে শিকার শিকার খেলায় । তখন বাচ্চা কটিকে নিয়ে আসেন জয়শীল । সেই থেকে ওরা এখানে পাল পাল জন্মে- এটাকে নিজেদের ব্যাঘ্র ভূমিতে পরিণত করেছে । সেও এক দেখার মতন জিনিস । অনেকে আজও বাঘেদের এড়িয়ে চলে এখানে । তবে বেশিরভাগ আশ্রমিকই ওদের সাথে মিলেমিশে থাকে ।

বড় বড় বাঘ এসে কোল জুড়ে বসে , হাই তোলে ।

মনে হয় যেন কুকুর বেড়াল !

জয়শীল বলতেন :: দেখো তো ওরা কত নিরীহ ! তোমরা অকারণে ভয় পাও । ওদের ক্ষতি না করলে ওরাও তোমার ক্ষতি করবে না । আগে থেকে এত ভয় পেয়োনা । ভয়কে জয় করতে শেখো । আমাদের

জীবনে পিছিয়ে পড়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল এই ফোবিয়া বা ভয় ।

এই রিসর্ট যাকে লোকে আশ্রমও বলে , সেখানেই প্রথম আলাপ হল গোমতীর সাথে । গোমতী রাজপুত । ভারতের মানুষ । অন্য একটি দেশে আগে কাজ করতো । সদ্য ভিসা নিয়ে এখানে এসেছে কাজের খোঁজে । আগে যেই দেশে ছিলো সেখানে জল্লাদের কাজে নিযুক্ত ছিলো ।

ফাঁসির আসামীদের যখন ক্যাপিটল পানিশমেন্ট দেওয়া হয় তখন ইলেকট্রিক চেয়ার ব্যাতীত lethal injection ও দেওয়া হয় । এছাড়া সেই দেশে আগে মুন্ডচ্ছেদ করা হত । গলাটা ঢেকে , মুখ ঢাকা বড় টুপী পরিয়ে গলা কাটা হত । এখন চেয়ার ও ওযুধে কাজ হয় । অনেক ওষুধ কোম্পানি প্রতিবাদ করেছে যে ওদের ওযুধ দিয়ে যেন মানুষ মারা নাহয় হোক্ না সে ফাঁসির শাস্তি । তাই অন্য কেমিক্যাল ব্যবহার করে এখন -আর কোনো ডাক্তার এগুলি করেনা বলে সাধারণ কর্মী নিযুক্ত করা হয় । এক একটা মৃত্যুর জন্য ৫০০ মার্কিনি ডলার পায় জল্লাদ । চিকিৎসকগণ ; মানুষ মারার জন্য বিদ্যার্জন করেন-নি বলে lethal injection দেয় সাধারণ , অপটু কর্মী । তাই

আসামীর মৃত্যু অসম্ভব কষ্টদায়ক হয় আর বেশিরভাগ সময়ই অ্যানাটমি না জানা মানুষের দেওয়া lethal injection-এ ; **মরার বদলে- অসম্ভব কষ্ট নিয়ে বেঁচেই থাকে মানুষটি , সময় যেন ফুরায় না ।**

তাদের আত্মীয়-পরিজন, একটা কাঁচের জানালার মাধ্যমে ঐ আসামীর শেষ শয্যার দিকে চেয়ে থাকে । অনেক সময়ই দেখা যায় যে মরার বদলে লোকটি পড়ে পড়ে কাঁতরাচ্ছে ।

এই নিদারুণ কষ্ট কাঁহাতক সহ্য করা যায় ? কত আর পয়সার দোহাই দিয়ে এইসব পাপ কাজ নাহলেও ভয়ানক কাজে নিজেকে নিযুক্ত করা যায় ? **তাই একপ্রকার পালিয়েই এসেছে গোমতী রাজপুত, জয়শীলের দেশে ।**

নতুন দেশে এসে জয়শীলের সন্ধান পায় গোমতী । ততদিনে তার অবসাদ শুরু হয়ে গেছে । বিষাদ , শোক । এতগুলো মানুষকে মারার কষ্ট ।

যথেষ্ট আয় করতো বলেই অর্থটা সমস্যা নাহলেও মনে কোনো শান্তি নেই । এইসময়ই এক পড়শী- ওকে জয়শীলের রিসর্টের কথা বলে ।

ওখানে নাকি এক ভারতীয় লাইফ কোচ আছেন যিনি ভাঙা পুতুল জোড়া লাগান ।

তারপর পুতুল নাচের আসরে সবাই খোল করতাল নিয়ে আনন্দ ফূর্তি করে । প্রথম একমাস ফ্রিতে থাকা যায় । ক্লাস করা যায় । পরে প্রয়োজন হলে যদি থাকা হয় তখন মাসিক একটা খরচ দিতে হয় ।

জয়শীলকে অনেকে পাপা বলে । জয়শীল প্রিচার নন , মেন্টার । তবুও পাপা । মেসাইয়া- Messiah !

গোমতীর চেয়ে অনেক বড় জয়শীল । একবার বিয়ে হয়েছে , পরে সেক্স ভিলেজে এক মুসলিম মেয়েকে গর্ভবতী করেন আর এখন লাইফ কোচ হয়ে একা থাকেন । গোমতীর থেকে ২২ বছরের বড় জয়শীল ।

তাঁকে পাপা বলে ডাকেনি কখনো গোমতী । এমনিই । তখন তো জানতো না যে এই মাস্টারমশাই-ই তার একাকীত্বের ফাঁসি দেবেন আর পরে স্বামী রূপে দেখা দেবেন ! তবুও কোনো রহস্যময় কারণে ওঁকে কোনোদিন পাপা বলে ডাকেনি ।

প্রথম দিকে এড়িয়ে চলতো । যেমন মাস্টার মহাশয়দের ক্ষেত্রে- সবাই করে । শিক্ষা, কিছু দরকারি কথা আর মাঝে মাঝে গল্প । এই চলে । তাকে নিজের প্রাইভেট লাইফে কেই-ই বা নামিয়ে আনে ?

লাইফ কোচ হলেও ! এখান থেকে বেরিয়ে গেলেই তো আর কোচও নয় । কাজেই দূরত্ব থাকেই । বিশেষ করে ভারতের লোকেদের ক্ষেত্রে ।

তাই পাপাকেও কোচিং এর পরে ; কিঞ্চিৎ এড়িয়েই চলতো গোমতী রাজপুত । মানুষকে পরপাড়ে পাঠিয়ে

পাঠিয়ে জীবনের আনন্দময় দিক্‌টা যেন ভুলেই গিয়েছিলো । বৈশালীতে এসে শুনতে পায় সেই মধুর লগ্নের পদধ্বনি --- নতুন দিনের পদধ্বনি !

কিন্তু পাপা নয় ; জয়শীলকে সম্বোধন করতো মিস্টার কর্মা হিসেবে । লোকে ওঁকে **জয় কর্মা** বলেই ডাকে - যারা আশ্রমিক নয় । কাজেই গোমতীও সেরকম ডাকে । লাইফ কোচকে তার কখনই রোমান্টিক এক মানুষ মনে হয়নি । ভদ্রলোক অবশ্য অনেকবার গোমতীকে ঈশারায় জানিয়েছেন যে উনি গোমতীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন । কোনো এক অজানা কেমিস্ট্রি ওদের মধ্যে খেলা করছে । **তবুও গোমতী ওঁকে ক্লাসের বাইরে এড়িয়েই চলতো ।**

গোমতীর সমস্যা অত্যাধিক মানুষ মারা । মেন্টাল ব্যালেন্সে অসুবিধে হয় । কেন সে এই কাজ করতে গেলো ? যা সমাজে আর কেউ করতে চায়না ? ওকে লোকে ঘৃণা করে হয়ত- বিশেষ করে কয়েদীর বাড়ির লোকেরা । সবাই ওকে দোকানে বাজারে জাজ্‌ করে চলেছে ! এই সেই মেয়ে ! লোক মারে , অকারণে ।

কারণ যাইহোক্‌ সেটা আইনের ব্যাপার ও তো স্বেচ্ছায় এই কাজ করে । তাই অকারণে বলে- লোকে ওকে

ঘৃণা করে । ত্যাজ্য করে । যতই মুখোশ এঁটে lethal injection দিতে ঘরে ঢুকুক !

জয় ওকে ফিরিয়ে এনেছেন সুস্থতায় । বলেছেন :: গীতায় আছে যে কর্ম করে যাও । ফলের কথা ভেবোনা । আর জাজ্ করছে সবাই এটা গোমতী ভাবছে । হয়ত কেউই এগুলি নিয়ে ভাবছে না । হয়ত ওকে মহানায়িকা ভাবছে যে মেয়ে হয়েও আইন রাখতে দুরাত্মাদের শাস্তি দিচ্ছে । বধ করছে । খুন নয় । কেন গোমতী এগুলিকে খুন মনে করছে ?

রাতের বেলায় চাঁদ উঠলে , পূর্ণ শশীর মাঝে কদম গাছের তলায় বসে কিংবা উইলো গাছের সারির মাঝে হাঁটতে হাঁটতে অনেক বোধের কথা বলেছেন । বুঝিয়েছেন । জীবন কী , জীবন কেন , কীভাবে অতিবাহিত করা উচিৎ , নিজের জন্য বাঁচা উচিৎ অন্যের জন্য নয় , কোনো কাজ করার আগে পজিটিভ ও নেগেটিভ যাচাই করে নেওয়া উচিৎ , ইউনিভার্সে মন্দ ও উত্তম বলে কিছু নেই । সবটাই দৃষ্টিকোণের ব্যাপার । কাজেই অহেতুক এত বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে গোমতী । তার উচিৎ নিজে যা সঠিক মনে করে তাই করা । কাজের চেয়েও কাজের লক্ষ্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ । কেন করা হচ্ছে । হোয়াই ??

একটা সময় উইলো গাছের, কাঁচা সোনার মতন রং যেন এসে লাগে গোমতীর মনে । সেই সোনাঝরা ক্ষণে মন দিয়েই বসে পাপাকে ।

পাপা ধীরে ধীরে সংসারি হন্ ! গোমতীর, দুটি সন্তানের পাপা হন । শক্তি আর সিন্ধু । দুই পুত্র ।

বাবার মতন ঋজু ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ।

সেক্স ভিলেজে থাকাকালীন, একটি মেয়ে জন্মায় এক বিধর্মী সাথীর সঙ্গে সহবাসের ফলে । সেই মেয়েই বড় সবার মধ্যে । তার নাম, তার মা রেখেছে কোমল ।

কোমলকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন জয়শীল । কারণ ব্যাক্তিগতভাবে ওঁর মেয়েদের বেশী পছন্দ । তাদের কোমলতা ও স্নেহময়ী ভাবটার জন্য ।

গোমতীকে অনেক ভাবে কনভিন্স্ করেছিলেন জয়শীল । তবেই বিয়ে হয়েছে । বয়সে অনেক ছোট গোমতী তো তাঁকে আগে- আরেকজন **অহংকারি এন আর আই মনে করতো যিনি নিজের অর্থ ও প্রতিপত্তি নিয়েই বুঁদ হয়ে আছেন** । সাধারণ মানুষের জন্য কাজ হল লোক দেখানো । বায়োড্যাটা সমৃদ্ধ করার জন্য । যাতে হিউমানিটারিয়ান অ্যাওয়ার্ড পেতে সুবিধে হয় ।

বিদেশে বসবাসকারি এক উজ্জ্বল ভারতীয় !

কিন্তু ধীরে ধীরে জয়ের মানবিক দিক্‌টা স্পষ্ট হয়েছে । দেখেছে যে উনি কত খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি । এখনও আকরিক্ । নির্ভেজাল । কচি, সবুজ সবুজ ধানের মতন মিহি আর সূর্যের তাপে ওষ্ঠ পোড়ালেও- আজও অসূর্যম্পশ্যা কোনো নরম মনের নারীর মতন কোমল । **একই সাথে উনি পাপা আবার মা-ও । মায়ের আঁচল আর বাবার ডানার উষ্ণতা ; দুটে একইসঙ্গে দিতে পারেন জয়শীল কর্মকার । সত্যি কর্ম-কারই বটে ।** অপাপবিদ্ধ এক কর্মকার, যাঁর কাজ শক্ত হাতে নির্মূল করা- মানুষের মনের **যতসব ভ্রষ্টাচার** !!

কাজেই মৃত্যুর মোমশিখায় অভ্যস্ত গোমতী, ধীরে ধীরে আলোয় ভরিয়ে তোলে নিজের গাঢ় আঁধারে ঢাকা

মনটাকে । সেক্স ভিলেজ থেকে খুঁজে আনে কোমলকে । তার মায়ের কাছে গিয়ে , অনুমতি নিয়ে এবং কথা দিয়ে যে কোমলকে নিজের মেয়ের মতনই মানুষ করবে গোমতী ।

ভরে ওঠে পরবাসে গোমতীর সংসার !

নিজ দুই পুত্র , সুপুরুষ সিন্ধু ও শক্তি --যারা সিন্ধুর মতন সীমাহীন মায়াবী আর শক্তির মতন দৃঢ় , স্ট্রং- তারা বটবৃক্ষের মতন দাঁড়িয়ে বৈশালীর দুইদিকে আর অন্দরে নিখাদ কোমলতা ! একধারে গোমতী আর অন্যদিকে কোমল নামক জয়শীলের প্রথম সন্তান !

হোক্ না অবৈধ ! মানুষ আবার বৈধ আর অবৈধ কি ?

মানুষ মানুষই - আর তার দুটো মা আছে, বাবা একজন হলেও ।

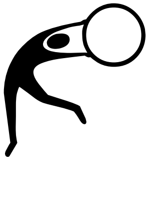

জয়শীল আর গোমতীর সংসার ; একটি বৃহৎ সংসার । সেই সংসারের হাত ধরেই বৈশালী সমৃদ্ধ হয় ।

আছে বাঘের বাচ্চারা । যারা জয়শীলের কোলেপিঠে মানুষ হয়ে আজ বৈশালীরই পোষ্য পশুর মতন ।

সিন্ধু আর শক্তি এই বাঘের সাথে খেলেই বেড়ে উঠেছে । বাঘকে ওরা ভয় পায়না । সখা মনে করে ।

----ফর্মটা আলাদা । ভেতরে একই মহাজাগতিক্ চেতনা বয়ে চলেছে --- হেসে বলতেন জয়শীল ।

----তুমি ওর ক্ষতি না করলে ও তোমার কোনো ক্ষতি করবে না !!! বলে হেসে উঠতো বিচ্ছু দুই ছেলে , শক্তি আর সিন্ধু ।।।

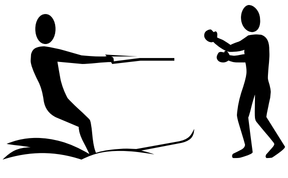

অন্য দেশে থাকতে, দেশী এক মহিলার সাথে ভারি ভাব ছিলো গোমতীর । তার নাম হেরিং । হেরিং এর সব ছিলো । স্বামী, পুত্র, সংসার । শুধু বাড়িটা ছিলো এক টিলার পাদদেশে । হেরিং , টিলার ধারে ক্যাপসিকাম্ ভাজা বিক্রি করতো আর ওর স্বামী বুটজুতো পালিশ করতো । মোটামুটি চলে যেতো ওদের ।

একদিন কোনো রাজনৈতিক গুন্ডার দল ;ওর স্বামীকে তুলে নিয়ে যায় অন্য এক আসামী সাজিয়ে । ফেঁসে গিয়ে স্বামী মারা যায় । ওর স্বামীকে মারে স্বয়ং আইন । পরে হেরিং এর সাথে অন্যত্র আলাপ হয় । যেহেতু

গোমতীর মুখটা lethal injection দেবার সময় কাপড়ে ঢাকা থাকে তাই অনেকেই ওকে চিনতে পারেনা । হেরিং বোঝেনি যে ও-ও আইনের কর্মী !

ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব হয় । পরে ওর দুই বাচ্চার পড়ার দায়িত্ব নেয়-গোমতী । তারা আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ।

কিন্তু দূর্ভাগ্য ওদের মায়ের । মাকে ওরা দ্যাখেনা । একজন রাজনীতিতে গেছে মায়ের কথা অমান্য করে । মা চায়নি- যেই রাজনীতির কারণে ওরা বাবাকে হারিয়েছে সেই রাজনৈতিক দলে ওরা যোগ দিক্ ! কিন্তু সমাজে নানান সুবিধে পেতে হলে পলিটিক্যাল যোগাযোগ থাকা আজকাল খুবই প্রয়োজন । তাই এক পুত্র ওদিকে গেছে । সে বলে :: কে কবে কোথায় বাবাকে ফাঁসিয়েছে তাতে সব রাজনৈতিক দল মন্দ হবে কেন ? আর পুরনো ওসব কথা মনে করলে কি বাবা ফিরবে ? কাজেই ঝগড়া করে লাভ আছে ?

অন্য ছেলে মাকে দ্যাখেনা, কারণ সে আজ শিক্ষিত এক যুবক যে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ায় । এরকম গোমুখ্য এক ফেরিওয়ালা মাকে, ভদ্রসমাজে বার করাই মুস্কিল তো পরিচয় দেওয়া । হাতে হাজা , নখগুলো উঠে গেছে , হলুদ লাগা পোশাক আর ঈষৎ কর্ণকুহরে শব্দহীন-মাকে সে পরিচিত মহলে চাকরানি বলে পরিচয় দেয় আর গোমতীকে নিজের মা বলে ।

হেরিং বেচারি একা থাকে । অনেক বয়স হল তো !

মাঝে কিছুদিন স্টেশানে কুলিগিরি করতো । অসম্ভব বুড়ো একজন, অন্য যুবক যুবতীদের স্যুটকেস্ আর অন্যান্য মাল, বয়ে নিয়ে যাচ্ছে । এই দৃশ্য মায়া কান্না নয় সত্যি সত্যি কান্না ঝরায় !

এখন চোখেও দেখে কম । একটা পোষা, হাড় জিরজিরে গরু আছে । সেটাকে বিক্রি করতে মেলায় নিয়ে যায় প্রতি শুক্রবার । আর মায়ার কারণে , বিক্রি করতে না পেরে ফিরিয়ে আনে । এইভাবে অনেক মাস কেটে গেছে ।

এখন এমন অবস্থা যে নিজেরই খাবার পয়সা নেই ! তবুও গরুটাকে জবাই করতে দিতে মন চায়না ।

শেষকালে গরুটি দান করে দেয় । এক ব্রাহ্মণকে ; যে গরু জবাই করবে না । কখনোই !

পরে হেরিংকে ; নিজ সংসারে নিয়ে আসে গোমতী । জয়শীলের অনুমতি নিয়েই ।

হেরিং ; এখানে রিসর্ট-এ সাফাইকর্মী । বসে বসে- একটা বড় তোয়ালে নিয়ে সমস্ত মেঝে মুছে ফেলে !

বিদেশে এই জিনিস দেখে লোকেরা অবাক !

হেরিং ভালো আছে । মাঝে ছেলেরা এসেছিলো । ওদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে ওদের চাকরানি মা !!

গোমতী খুব হেসেছে শুনে । বলেছে :: বুড়ি ওদের ক্ষমা করতে পারলো না ! আরে ওরা তো অবুঝ ! ছেলেমানুষ । দুনিয়াদারি আরো কিছুদিন দেখুক সব

বদলে যাবে তখন !! বুঝবে যেমনই হোক্ , বাবা মায়ের চেয়ে বড় শুভাকাঙ্খী আর এই জগতে কেউ নেই ! সবাই মনে করে তারা আরো উত্তম জাতের বাবা ও মা পেতে পারতো কিন্তু বেলাশেষে যখন সূর্য অস্ত যায় তখন বোঝা যায় যে যা পেয়েছে তাও অনেক অনেক মানুষ এক জীবনে পায়না ।

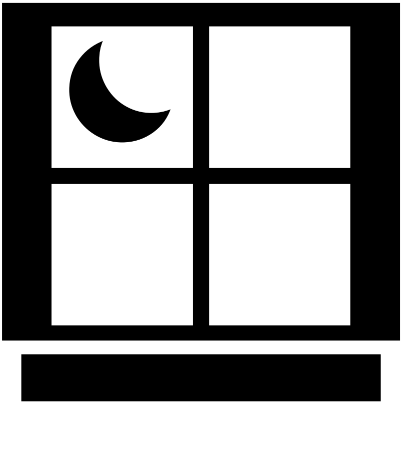

গোমতী নিজে বিদেশে পড়তে যায় । ফরেন্সিক বিজ্ঞান । উচ্চশিক্ষা নিতে যায় । সেখানে ছিলো ওর দাদা গোমুখ । গোমুখ নিজে প্রযুক্তিবিদ্ । প্রথমে বোনকে যথেষ্ট সাহায্য করলেও পরে তার স্ত্রী ওকে গৃহহীন করে । নিজেকে কাজ করে করে পড়ার ফিজ্ দিতে হয় । ৬মাস পড়তো বাকি ৬মাস কাজ করতো । এভাবেই চলছিলো । কিন্তু লাস্ট সেমিস্টারের সময় সমস্যা দেখা দেয় । অসুখে ভুগে দেশে ফিরে গেছে তখন গোমতী । তার মা ওখানে নিজের ছোট আচারের ব্যবসা করতেন । বাবার ব্যবসা নয় , মা নিজে শুরু করেন । ওদের পৈত্রিক ব্যবসাতে মাকে নিতে চায়নি । নারী বলে । মা তখন নিজেই ব্যবসা শুরু করেন ও দাঁড় করান । বাবা মারা যান কম বয়সে । তাই মায়ের আয়েই সংসার চলতো । দাদা পরে বিদেশে চলে যায় । গোমতীও লেখাপড়ায় ভালো ছিলো তাই দাদার কাছে চলে যায় ।

দেশে ; এসে অনেকদিন ছিলো । মা তাকে সুস্থ করে তোলেন । মায়ের ব্যবসায় ওকে যোগ দিতে বলা হয় ।

গোমতী স্থির করে, বিদেশে গিয়ে কাজ করবে। ফিরে যায় সেইদেশে। **যেখানে কয়েকবছর আগে স্বপ্ন কিনতে গিয়েছিলো।** ফরেন্সিক জগতে কাজ করার ইচ্ছে প্রবল। তাই পরে কয়েদীদের lethal injection দেবার কাজে যোগ দেয়।

হয়ত পরে উচ্চশিক্ষাও নিয়ে নিতো কিন্তু একনাগাড়ে মানুষকে পরপাড়ে পাঠাবার পরে মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। **বিষাদ কন্যা হয়ে ওঠে গোমতী।**

দ্বিতীয়বার এইদেশে ফেরার পরে ওর দাদা, গোমুখও খবর নেয়নি। গোমুখ সরাসরি মাকে ফোন করে। গোমতীর ফোনের কিংবা পত্রের কোনো উত্তর পায়না। বৌদি না হয় অখুশী কিন্তু দাদার তো সে একমাত্র বোন ! আগে দাদা ওকে কত উৎসাহ দিতো। বলতো :: লেখাপড়া বিদেশে করলে মানুষ অনেক এগিয়ে যেতে পারে ! ওদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভিন্ন ও উন্নত ধরণের। বই মুখস্থ করা কিংবা প্রাইভেট কোচিং নিয়ে রেজাল্ট ভালো করা এইসবের চেয়ে ওরা ট্যালেন্টকে এগিয়ে দেওয়ায় জন্য কাজ করে।

দাদার প্রেরণায় , দাদার ভরসায় বিদেশে পড়তে আসা । অনেক ইউনিতে ও চান্স পেয়েছিলো । তার মধ্যে থেকে সর্বসেরাকে বাছে । কিন্তু শেষরক্ষা হলনা ।

তবুও বায়োডাটাতে লেখে যে একসময় ঐ ইউনি-র ছাত্রী ছিলো সে ।

উচ্চস্তরের ডিগ্রী না পেলে কী হবে, এমন কাজ সে করে এসেছে যে অন্যধরণের এক অভিজ্ঞতা তার হয়েছে এবং জীবনের প্যারালাল এক কালো দিকের সাক্ষী হয়ে রয়েছে ।

মারা যাবার আগে সব কয়েদী হা হুতাশ করেনা ।

অনেকে পেট ভরে সুস্বাদু খাবার খায় এবং মারা যায় । কেউ চার্চের কল্যাণে অনেক শুধরে যায় । কেউ তুমুল গালিগালাজ করে সিস্টেমকে । বলে :: আমাদের ধরে এনে এনে এত মারিস্ , অত্যাচার করিস্ বিচারের নামে ; একবারও ভেবে দেখেছিস্ যে তোরা যা করিস্ সেটা কি ন্যায় সম্মত ?

কেউ সমানে কার্স করে , শাপশাপান্ত , বাপ্‌বাপান্ত করে জাজ্‌কে । প্রিজন অফিসারদের । কেউ ভালোমানুষের মতন ক্ষমা চায় । বলে :: আমি তো

সময়ের চাকা ঘোরাতে অক্ষম , যদি পারতাম তাহলে আমার কীর্তি মুছে দিতাম । কোলে তুলে নিতাম, বুকে জড়িয়ে ধরতাম তাদের যারা আজ আমার কর্ম ফলে হয় মৃত অথবা অসম্ভব ভুগছে ।

এক মহিলার কাছে, যাকে রেপ করেছিলো এক আসামী শুনেছে গোমতী - যে ঘটনার পরে মনে হত যেন সবাই ওকে রেপ করছে । তার নিজস্ব শালীনতা ও প্রাইভেসি বলে আর কিছুই নেই । জামাকাপড়ের মধ্যে দিয়ে লোকে ওকে স্পর্শ করছে , স্তনের ওপরে হাত বোলাচ্ছে !

আগে গোমতী ভাবতো যে রেপ ভিকটিম্রা কেন ভুলে যেতে পারেনা এই ঘটনা ! কেন এই পাশবিক ব্যাপারটা ওদের জীবন বদলে দেয় । কিন্তু ঐ মহিলার সাথে দেখা হবার পরে যেন কেউ ওকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো যে ঠিক কী অনুভূতি হয় কাউকে ধর্ষণ করলে ।

একটি দেশের এক মেয়ের সাথে দেখা হয় । তাকে তার কাজিনরা রেপ করেছে সম্পত্তি হাতাবার জন্য কিন্তু ওদের দেশের আইন কোনো ব্যবস্থা নেয়নি । তার কারণ ওখানে রেপ কেস আদালতে প্রমাণ করা যায়না । রেপ ব্যাপারটা প্রমাণ করার জন্য ৫জন সাক্ষী লাগে । কিন্তু রেপের সময় সাধারণত: ৫জন লোক সেখানে

থাকে না । থাকলে তারাও দুষ্কৃতির দলেরই লোক অথবা এমন কেউ যাদের কোনো মেরুদন্ড নেই ।

সেরকম ৫জনের মতন ৫জন থাকলে তারা সবার আগে রেপটা বন্ধ করার চেষ্টা করতো । কাজেই কোর্ট-কেসটা বন্ধ হয়েই যায় । বিদেশে রেপের শাস্তি হচ্ছে দেখে সেই মহিলা খুবই আনন্দ পেয়েছে ।

আরেক মানবী নিজেই অত্যন্ত মধ্যবিত্ত । প্রতিটি পাই পয়সা হিসেব করে খরচ করতে হয় তাকে । অথচ নিয়মিত নিজের কবরের ভাড়া দিয়ে যেতে হচ্ছে । কবে মারা যাবে কেউ জানেনা । কবরের স্পেস কিনতে অক্ষম বলে জায়গা ভাড়া করে রেখেছে। আর তাই **সুদসহ** দিয়ে যেতে হচ্ছে । এই উটকো খরচের পাল্লায় পড়ে বিপথ ধরে । যেখানে কাজ করতো সেখানেও মাঝে মাঝে সরকার মাইনে বন্ধ করে দিতো । তাই অন্ধকার রাস্তায় আসতে হয় ।

অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে গোমতীর । একগাদা ডিগ্রী মাথায় নিয়ে এসব জগতে না যাওয়াই ভালো । অনেক সীমারেখা ভাঙতে হয় তখন ।

অনেক দু:খের মাঝে গোমতীর একটুই সুখ, আজ।

--এত জীবনবোধ কোথায় পেলেন ?

অনেকবার প্রশ্ন করেছে লোকে, জয়শীল কর্মকারকে ।

উনি মৃদু হেসে বলেছেন :: এগুলো নিয়েই জন্মাতে হয় । ফেসবুক আর টুইটারে বসে জীবনবোধ সংগ্রহ করা যায়না । যা যায় তাহল তথ্য বা তত্ত্ব ।

ওঁর বৈশালী আশ্রমে এক নারীর আবির্ভাব হয়েছিলো ।

তার দুই পুত্র ছিলো । তাদের ধরে নিয়ে গেছে ওদের মাতৃভূমির সেনাবাহিনী । ওখানে নাকি কিশোর আর যুবকদের ওরকমভাবে জোর করে আর্মিতে নিয়ে যায় । প্রায় ছিনিয়েই বলা যায় । সেইদেশের শাসক এক নামজাদা ডিক্টেটর । তার মাথায় একটিও চুল নেই । হয়ত তাই সে চুলওয়ালা মানুষ দেখলেই তাকে জেলে পুড়ে দেয় । সেজন্য ওখানে প্রায় সবারই মাথা ন্যাড়া । ওরা বলে কেমোকাট্ । কেমোথেরাপি নিলে যেমন চুল পড়ে যায় সেরকম ওরা জন্ম থেকে কেমোকাট্ করে ফেলে । মেয়েরাও ওখানে ন্যাড়া । সুন্দর, কালো, ঘন কেশরাশি নিজ হাতে ছেঁটে ফেলা নিয়ম । শাসকের

ভয়ে । এই মহিলা যার নাম চেকোজো ; সে খানিকটা আধপাগলা হয়েই আসে, বৈশালীতে ।

বিশেষ ভিসায় বিদেশে আসে । করুণা ভিসায় ।

ওর নিজ জন্মভূমে , জীবন প্রায় এক যন্ত্রণার নামান্তর মাত্র। ওদের শাসকের পা চাটতে হয় সবাইকে , মাটিতে শুয়ে । আর বিদেশে কেউ খেলতে গেলে যদি হেরে যায় তখন তাকে সবার সামনে গুলি করে মারা হয়, পাগলা সারমেয়র মতন ।

দুটৈ একরকম । এইক্ষেত্রে মানুষটি অসহায় । সে খেলতে গিয়েছিলো । যুদ্ধ করতে নয় । আর পাগল হওয়া সারমেয় কিন্তু প্রচন্ড যন্ত্রণায় কামড়াতে থাকে । ওটা তার অসুখ । কাজেই সেও অসহায় ।

কাজটি পাশবিক সন্দেহ নেই ।

চোকোজো ; আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকতো । নড়তো না । হাত ওঠালে হাতটা সেইভাবেই রেখে দিতো । ভয়ে । কেউ যদি ওকে মারে !

লাইফ কোচ ওকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন ।

বৈশালীতে আছে -- সাইকোলজিস্ট, যোগ বিশেষজ্ঞ , ডায়েটিশিয়ান , লাইফ কোচ , নাচ-গানের শিক্ষক , পেন্টিং শেখানোর লোক (কালার করলে নাকি স্ট্রেস কমে যায়) আর হাসানোর জন্য কিছু ক্লাউন । কমেডিয়ান ।

এখানে এসে আজ পর্যন্ত কেউ নিরাশ হয়ে ফেরেনি । যেন চৌকাঠ পার হলেই একরাশ আনন্দ এসে মনটাকে ঘিরে ধরে । এক অদ্ভুত নীরবতা আর শান্তির স্পর্শ পায় চূড়ান্ত অসুস্থ মানুষটিও ।

লোকে বলে এগুলি সবই জয়শীলের পজিটিভ এনার্জির কারণে হয় । তা কিছু তো আছেই মানুষটির , স্পেশাল পাওয়ার । এত লোক আসছে , কুর্ণিশ করছে , শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখাচ্ছে । লোকে গ্রেটফুল থাকে । এত সেল্ফলেস্ এক সোল ; আজকাল দেখা যায়না ।

সবসময় অন্যদের উনি আগে রাখেন । নিজেকে সবার শেষে । নিজে যা খান সবাইকে ভাগ করে দেন ।

যেন এই বিশাল বৈশালী, ওরই দেহ আর মানুষগুলি ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ।

আজ সেই মানুষটি শুয়ে আছেন শেষ শয্যায় ।

লোকে লোকারণ্য । আসলে হঠাৎ মারা গেছেন তাই বিনা মেঘে বজ্রপাত হওয়াতে লোকেরা দিশেহারা । আগে থেকে ইঙ্গিত থাকলে হয়ত মানুষ নিজেকে কিছুটা গুছিয়ে নিতে পারে ।

এই শোক অসহ্য । অসহ্য এই ভাবনা যে বৈশালীতে গেলে আর দেখা যাবেনা জয়ের হাসি হাসি মুখে ।

বাজখাঁই গলার ডাকে :: একে ভেতরে নিয়ে যাও ।

পেট ভরে খাইয়ে দাও , বিশ্রাম করুক । বিকেলে দেখা হবে আমার সাথে ।

ওঁর উপস্থিতিই অসম্ভব উজ্জ্বল । এরকম কিছু কিছু মানুষ থাকেন যাদের প্রেজেন্সই মনে মাধুরি ছড়ায় ।

মানুষ যেহেতু বাই নেচার এক পলিটিক্যাল অ্যানিমাল তাই দুজন একসাথে হলেই শুরু হয় এর তার বিরুদ্ধে নানান পলিটিক্স করা । কিন্তু জয়শীল বোধহয় একমাত্র মানুষ যাকে কেউ অপছন্দ করেনা । আর শত্রু

থাকলেও তার সংখ্যা এতই কম যে ধরার কোনো মানেই হয়না ।

তবে গোমতীকে বিয়ে করার পরে অবশ্য অনেকেই ওর বিরুদ্ধে কথা বলেছিলো । কারণটা অবশ্যই গোমতীর পূর্ব পেশা । **কিন্তু পরবর্ত্তীকালে গোমতীকে কাছ থেকে দেখে লোকে মত বদলে ফেলে ।**

জয়শীলের একমাত্র কন্যা কোমলকে, সেক্স ভিলেজ থেকে তুলে এনে নিজ সংসারে , নিজের মেয়ের মতন মানুষ করেছে গোমতী । এই ভালো কাজের প্রশংসা না করলেই নয় । তাই লোকের মন বদলে গেছে ।

কোমল খুবই ভালো মেয়ে । আজকাল সে ইউ-টিউবে একটি চ্যানেল চালায় । এছাড়া বৈশালীর টিভি চ্যানেলও সে দেখে । সেখানেই সমানে দেখানো হচ্ছে জয়শীলের মৃত্যুর খবর । লোকে লোকারণ্য আজ বৈশালীর দরবারে ! সবুজ ঘাসের কার্পেটে নামীদামী গাড়ির মেলা । সবাই আসছে শেষ দেখা দেখতে । সমাজের সর্বস্তরের মানুষ এইভাবে সবার দাহ-কার্য দেখতে যায়না ।

জয়শীলের বিশেষ ইচ্ছে ছিলো যে তার মুখাগ্নি করবে কোনো মেয়ে । ছেলেরা নয় । মেয়েদের খুবই

ভালোবাসতেন উনি । উনি সবসময় কন্যা সন্তানের জন্য মুখিয়ে থাকতেন । তাই প্রথম সন্তান মেয়েই হয়েছিলো । কোমল । সবাই ভাবলো যে উনি চান কোমলই তার মুখাগ্নি করুক ।

শাস্ত্রমতে কী হয় তার চেয়েও বড় কথা এটা পরবাস । এখানে নিজেই শাস্ত্র আর নিজেই অস্ত্র । কোন অস্ত্র দিয়ে- শাস্ত্রের কোনো অলিখিত ও বস্তাপচা নিয়ম মানুষ কাটবে তা স্থির করে নিজেরাই । তাই কটাক্ষ করার কেউ নেই ।

সুসজ্জিত চিতা। শোয়ানো জয়ের দেহ । মাথায় ফুলের বাহার । ফুলের মুকুট । কপালে চন্দন । তাতে লাল চন্দনের বড় তিলক । দেহ ঢাকা সবুজ কাপড়ে । গাঢ় সবুজ । বুকের ওপরে বৈশালীর ছোট ফ্ল্যাগ ।

বড় বড় করে লেখা গীতার শ্লোক :: বাসাংসি জীর্ণানি- যথা বিহায়:--

সবাই মালা দিচ্ছেন । পুষ্প স্তবক বৈশালীর ফটকের সম্মুখেও । যেন মনে হচ্ছে এটা কোনো পার্ক । গেটটি ফুল দিয়ে সাজানো ।

সাদা পোষাকে আজ গোমতী । কোমল । শক্তি ও সিন্ধু । সিন্ধু, মায়ের মতন ফরেন্সিক নিয়ে পড়েছে আর শক্তি, বাবার মতন কাজ করে ।

কোমল সাংবাদিক । মিডিয়াতে আছে । নতুন শিহরণ- ইউ-টিউবে চ্যানেল চালায় । স্বাধীনতা থাকে কাজে আর সারা দুনিয়ার মানুষ অংশ নিতে ও দেখতে পারে।

লেটেস্ট টেক্নোলজি এতই উন্নত যে এক একটা মিডিয়া মাস্টারপিস্ বানায় কোমলের চ্যানেল সামান্য কিছু উপাদান নিয়েই । ভারতের কম উন্নত সব শহর থেকে- এখানে প্রেজেন্ট করার জন্য যুবক যুবতীরা আসে । যাদের আগে লোকে আনস্মার্ট ও আন ইম্প্রেসিভ্ ইত্যাদি স্ট্যাম্পে ভূষিত করতো সেইসব তরুণ ও তরুণী , ভাঙা ইংলিশ ও অতিরিক্ত কালারফুল পোশাক নিয়েই এইসব চ্যানেলে ভাস্বর । সারা দুনিয়া জুড়ে সবাই উপভোগ করতে পারে বলে সমালোচনার কায়দা ও নিয়মও ভিন্ন ।

গ্রাসরুট থেকে খবর চয়ন করে কোমল । নিজের জন্মস্থান ঐ সেক্স ভিলেজ নিয়েও একটি ডকুমেন্টারি করেছে । যা অসম্ভব লোকপ্রিয় হয়েছে । বৈশালীর যা

কিছু সমস্যা আছে সেগুলো নিয়েও ওরা প্রচার করে । তাতে জয়শীল বিরক্ত হননি ।

--সমালোচনা যদি পজিটিভ হয় তাহলে তা মানুষকে সমৃদ্ধ করে । সেইদিক থেকে দেখলে সমালোচকরাই প্রকৃত বন্ধুর ভূমিকা নেয় ---এইসব বলতেন উনি ।

কোমলের কাজ নিয়ে খুবই গর্বিত ছিলেন । শুধু জানতেন না যে তাঁর আরো একটি মেয়ে আছে ।

আর সেই মেয়েই তাঁর প্রথম সন্তান ।

নয়ন সাহার কোলেই জন্মায় যশোধরা । যশোধরা কর্মকার । মেয়েটি বড় হলে, জন্ম সংবাদ দেবার সময় জয়ের পরিবার , নয়নের বাড়ির লোককে জানায় যে তাদের ছেলে , সংসারের বন্ধন ত্যাগ করেছে । কোন এক যৌন কেন্দ্রে গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে । মনে হয় সে আর ফিরবে না । দেশে তো নয়ই , সংসারেও না ।

কাজেই নয়নের কন্যা যশোধরা , নিজ পিতৃমুখ দেখা থেকে চিরটাকাল বঞ্চিতই ছিলো ।

দেশের সাথে তেমন যোগাযোগ না থাকায় জয়শীলও জানতেন না নয়নের এই মাতৃত্বের উপাখ্যান ।

সাহাকূলে ভালই আদর যত্নে বেড়ে ওঠে যশোধরা ।

মায়ের মতনই দেখতে ভালো। আরেক গ্রেসি সিং।

সাবলীল, মিষ্টত্বে মোড়া এক নরম মনের মেয়ে।

মোম্‌হাট অঞ্চলের সেরা স্কুলে মেয়েকে পড়িয়েছে নয়ন সাহা ওরফে কর্মকার। পরে তাকে কলকাতার কলেজে পড়তে পাঠায়। সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি। সেই বিশ্ববিদ্যালয়; আদতে এক রাজবাড়ি। প্রাচীন রাজবাড়ি।

সেখান থেকে পড়াশোনা করে যশোধরা ইউ-টিউবে কাজ নেয়। তার সৎ বোনের চ্যানেলে।

দুজনের খুবই বন্ধুত্ব হয়।

সে জানতে চায় যে তার বাবা, জয়শীল কর্মকার কেমন মানুষ ; যশোধরার কথা জানতে পারলে তাকে বুকে টেনে নেবেন নাকি ছুঁড়ে ফেলে দেবেন তার মায়ের মতন ? গ্রাম্য বধূ বলে ?

যেই মানুষের শ্রীচরণে ,এত অসহায় লোক ঠাঁই পায় তিনি কি সমাজের সামনে, যশোধরাকে আনতে পারবেন ; নিজ কন্যা ও প্রথম সন্তান বলে ?

লজ্জা করবে না ? ইতস্তত:বোধ করবেন না ?

প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়েছে কোমল।

কোমল, বাবাকে খুবই ভালোবাসে । তাই বলেছে যে তাকে যখন গ্রহণ করেছেন তখন বৈধ সন্তান যশোধরাকেও নিশ্চয়ই কোলে তুলে নেবেন । বাবার নাম জয় বলে মেয়ে যশ ।

যশোধরা হেসেছে । এই অল্প কিছু বছরেই অনেক কিছু দেখে ফেলেছে । বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে । লোকে বলেছে :: তোর বাপ্ এক ভ্রষ্ট মানুষ । শেষমেশ বিদেশের যৌন কেন্দ্রে গিয়ে উঠেছে !

নয়ন সাহার পরিবার অবস্থাপন্ন বলেই একঘরে হয়নি নয়ন ও যশোধরা । কিন্তু লোকে একপ্রকার কাদা ছুঁড়েছে ওদের দিকে ।

জয়শীল অবশ্যই যশোধরার কথা, মৃত্যুর আগে জানতেন না । কারণ জানার আগেই হঠাৎ মারা গেছেন । লোকে অবশ্য বলেছে যে কেবল দেহটা স্থির হয়েছে । চেতনার স্পর্শ যেন পাওয়া যাচ্ছে আগের মতনই, বৈশালীর আনাচে কানাচে । **সেই শান্তি , মুগ্ধতা আর মরমী করাৎ এর আহ্বান । মনের কুটিলতার শিরচ্ছেদ করার জন্য ।**

আগের মতনই প্রেম, ভালোবাসা , স্নেহে ভরে উঠছে মন -বৈশালীতে প্রবেশ করলেই !

যেন কিছুই হারায়নি । কিছুই ফুরায়নি । শুধু একটা পুরনো খোলস্ ত্যাগ করে গেছে কেউ । যেমন সাপ খোলস্ ছাড়ে । গাছ ঝরায় শুকনো পাতা । বল্কল ।

আছেন উনি , অন্য কোথাও । শুধু এখনো খোঁজা হয়নি । সবাই শোকে মেতেছে । কিন্তু উনি কোথাও যাননি । যেতে পারেন না । বৈশালীর প্রতিটি কোণায় , প্রতি ঘাসে ঘাসে ওঁর বিচ্ছুরণ । মানুষ এখন বিহ্বল হয়ে পড়েছে তাই আবেগে সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না । তবুও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।

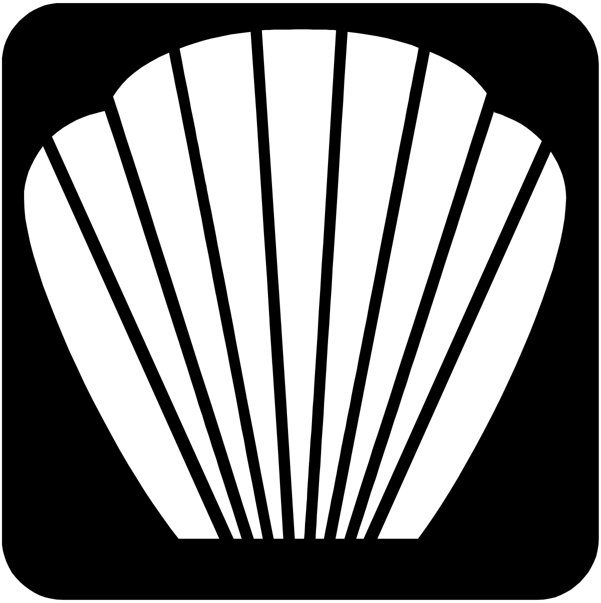

চিতা সাজানো হয়েছে । কাঠের ওপরে কাঠ । বিদেশে এইভাবে কাঠে পোড়ানো হয়না সাধারণতঃ তবে বিশেষ অনুমতি নিয়েই জয় কর্মার চিতা তৈরি করা হয়েছে । দাহ কার্য শুরু হবে । মুখাগ্নি করার কথা কোমলের । একজন নারীর । তার বাবা ,

এমনটাই চেয়েছিলেন । নারী, তাও অবৈধ্য । বৈধ্য সন্তান চিতার পাশে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও !

"----শাস্ত্র তৈরি হয়েছে মানুষের জন্য, মানুষ শাস্ত্রের জন্য নয় । আমরা সমাজপতিরা যদি এসব অন্ধ সংস্কার না ভাঙি তাহলে সাধারণ মানুষ শিখবে কোথা থেকে ? আমরা তো ওদের থেকে বিবর্তনের উচ্চস্তরে দাঁড়িয়ে । তাই উদাহরণ আমাদেরই সৃষ্টি করতে হবে ! ধর্ম মানে খোল করতাল নিয়ে রোজ কীর্তন গাওয়া নয় আর জোর করে কাউকে বিধর্মী করাও নয় । ধর্মের প্রকৃত অর্থ হল, সোজা ইংলিশে :: প্রপার্টিজ্ । যে যার ধর্ম মেনে চলে বলেই প্রকৃতি একটা নিয়ম মেনে চলে । যখন অত্যন্ত বেশি অনিয়ম হয় তখন সব ধবংস হয়ে যায় । আবার বিবর্তনের পরের ধাপ শুরু হয় । নতুনভাবে নিয়ম মেনে সব সৃষ্টি হয় । **যুগযুগান্ত ধরে এরকমই চলে আসছে ।**

কিছু অচল নিয়ম মেনে বৃহৎ সংখ্যক জীবের ক্ষতি করা কিংবা তাদের দু:খ দেওয়া আসল অধর্ম । এই জগতে সবাইকে তার ধর্ম মানে প্রপার্টিজ্ পালন করতে দেওয়া হোক্ । সেটাই প্রকৃত ধার্মিক হওয়া ।

এই দুনিয়া স্বয়ম্ভূ । এটা কারো পিতৃপুরুষের সম্পত্তি নয় । কাজেই সবাইকে সবার ধর্ম মেনে চলতে দেওয়া উচিৎ । সারমেয়র ধর্ম হল প্রভুর দেখভাল করা ,

সিংহের ধর্ম শিকার করে খাওয়া , মানুষের ধর্ম হল মানবিকতা , সহনশীলতা আর সহযোগিতা ।

এই যেমন আমি এখন করছি ----

---বলে গুরুগম্ভীর গলায় কথা বলা বন্ধ করে হেসে পরিস্থিতি হাল্কা করতেন জয়শীল কর্মকার , যাঁর ধর্ম ছিলো মানুষকে জীবনপথে সাবলীলভাবে চলতে শেখানো । একটি লন্ঠণ দেখানো , গাঢ় আঁধারে । মোমশিখা, প্রজাপতি যা ইচ্ছে বলো !!!

বৈশালীতে অনেক মানুষ তো এসেছে । সুস্থ হয়ে জীবনপথে পা বাড়িয়েছে আবার নতুন উদ্যমে ।

টম এর মা অকালে মারা গেলো । টম ও তার দুই ভাই দিশেহারা । বাবা একা সমস্ত সামলে ওদের বড় করে । আর বিয়ে করেনি । টমের একটাই প্রশ্ন ছিলো জয়ের কাছে যে ওদের মা কেন এত তাড়াতাড়ি অ্যাঞ্জেল হয়ে গেলো ।

জয় হেসে বলেন :: তোমাদের মা তো খুব ভালোমানুষ তাই বাচ্চা অ্যাঞ্জেলদের দেখার জন্য ওকে নিয়ে গেছে । আরো অনেক বাচ্চা ওখানে অসহায়ভাবে ছিলো তাই ।

রেনি ভ্যাড়ভ্যাড়ে ; মানে রেনির সমস্যা আলাদা । সে সবার কছে জিজ্ঞেস করে বেড়ায় যে স্বপ্নের স্ক্রিপ্ট রাইটার কে ?

এই যে আমরা সবাই সুন্দর বা ভয়ানক সমস্ত স্বপ্ন দেখি তার স্ক্রিপ্টগুলি কারা লেখে ? কোনো প্ল্যান ছাড়াই একের পর এক সিন্ সেখানে দেখা যায় । এর রচনা কে করে ??

ওর স্বপ্ন ছিলো একজন মডেল হবার। সুন্দর স্বাস্থ্য ও চামড়া এবং যোগ্য মুখশ্রী ছিলো তার । তাই কলেজ শেষ করেই মডেল হবার ক্লাস করবে ভেবেছে।

কিন্তু হঠাৎ এক অযাচিত কারণে ওর সেই স্বপ্ন ভঙ্গ হয় । তখন সে ফ্যাশানে যায়। নানান পোশাক তৈরি করে গরীবের মেয়েদের পরাতো । বস্তি থেকে তাদের আনতো । তারা পয়সা পেতো এর জন্য, তবে নামী মডেলের থেকে অনেক কম !

রেনি ভ্যাড়ভ্যাড়ের বক্তব্য হল এই যে-- **রূপসীকে যে কোনো পোশাকে উজ্জ্বল দেখাবে । কিন্তু শীর্ণকায়া , অপুষ্টিতে ভোগা দেহে যেই পোশাক সূর্যোদয়ের আবীর ছড়াতে সক্ষম, সেই পোশাকই ফ্যাশান ডিজাইনারের আসল সৃজনীর পরিচয় দেয় ।**

যথারীতি ফ্যাশান দুনিয়ায় এই প্ল্যান চলেনি ।

কাজেই সে জানতে চায় যে এইসব স্বপ্ন যা কোনোদিনও সার্থক হবার নয় তার স্ক্রিপ্টগুলি লেখে কে ??

পামেলা এক দেশ থেকে এসেছে । সেখানে শিশুদের ধরে নিয়ে গিয়ে জোর করে মঙ্ক বানায় । তারা কী করতে চায় জীবনে সেটা না জেনেই জোর করে এগুলি

করে আসছে সমাজের এক শ্রেণী , যুগ যুগ ধরে । কেউ প্রতিবাদ করেনা এই ঘটনার ।

এই শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ । তাদের আধুনিক সমাজের স্পর্শ পেতে দিচ্ছে না একদল মানুষ ।

তাই তুমুল সমালোচনা করছে পামেলা । ঐ মানুষদের ও শাসক গোষ্ঠীর । জয়শীল ওকে বলেন ::: ডোন্ট্ জাজ্ এনিওয়ান । ডু ইওর ওন্ ওয়ার্ক । দ্যাট্ ইজ দা বেস্ট অ্যাপ্রোচ !!

নিজের সম্পর্কেও একই কথা বলতেন --- **আমি কাউকে জাজ্ করিনা, নিজের কাজ করে যাই । সেটাই যথেষ্ট বলে মনে করি ।**

বৈশালীর প্রতিটি বাঁকে রাশি রাশি গল্প ।

শব থেকে মানুষ হবার কাহিনী ।

জয়শীলের বায়োগ্রাফি লিখেছে এক লেখক । কিন্তু তাতে যথেষ্ট স্ক্যাম নেই বলে প্রকাশক ছাপাতে অস্বীকার করে । মিডিয়ার এই রূপ দেখে ওর কন্যা কোমল নিজেই ইউ-টিউবে একটা চ্যানেল শুরু করে ।

নিজের মতন করে চালাবে । কারো চোখ রাঙানো কিংবা আদেশ শুনে নয় ।

জয়শীল শুনে খুব হেসেছেন । বলেছেন :: **আমার সেক্স ভিলেজ অভিযান সম্পর্কে জানতে চায় তাই না ?**

তা অন্য লেখকের কলমের মাধ্যমে কেন ? প্রকাশককে বলো আমার কাছে চলে আসতে । আমি এমন এমন জিনিস জানি , এমন সমস্ত দূর্দান্ত স্ক্যান্ডেল যা আর অন্য কেউ জানে না !

বলে প্রাণ খুলে হেসে ওঠেন ।

লেখকের নাম হৃদয়নাথ দুবে । উনি বলে ওঠেন :: আসলে ওরা মানুষটাকে জানতে চায় না । মশলা চায় । নোংরামো পড়তে ও পড়াতে ভালোবাসে । এইভাবে সমাজের মধ্যে নিম্নরুচির জিনিস ছড়িয়ে দেয় ওরা । তবে সৌভাগ্য যে সব প্রকাশক এরকম নয় আর প্রযুক্তি এত উন্নত হয়ে গেছে যে মিডিয়ার সংজ্ঞা বদলে গেছে । তাই মানুষ এখন নিজেই মিডিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম । ফেসবুক, টুইটার ও ইউ-টিউবের মাধ্যমে ।

বিভিন্ন মানুষের, বিভিন্ন সমস্যা নিয়েই তো কাজ জয়শীলের ! তাই বৈশালীতে এরকম হাজার হাজার সত্য ছড়িয়ে আছে ।

শুনলে অবাক লাগে । অনেক কিছুই বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় । যেমন গৈরিক নামক এক যুবক এখানে আসে কেমন যেন অসাড় হয়ে ! মেন্টালি । দৈহিকভাবে নয় । আসলে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে বৃন্দাবনে মধুচন্দ্রিমা করতে যায় । ওখানে নিধিবন নামক এক উপবন আছে-- সেখানে সন্ধ্যার পরে কারো প্রবেশ নিষেধ । পশুরা , এই যেমন বাঁদর বা ইঁদুরের প্রবেশও নিষিদ্ধ । ওরাও আর আলো ডোবার পরে ওখানে যায়না । ওখানে নাকি রাতের বেলায় রাসলীলা হয় । আজও কৃষ্ণ ও রাধা সমস্ত গোপিনীকে নিয়ে নাচে । বাইরে থেকে সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা শোনা যায় ।

পুরোহিতের সাজিয়ে দেওয়া সুপুরি , পান ইত্যাদি বাঁকে বিহারী রাতের বেলায় খেয়ে যান । ভোরে ; আর্দ্ধেক পাওয়া যায় খাদ্য সমগ্রী । শয্যায় যেন কেউ শুয়ে থাকে । সেগুলি ওলট্ পালট্ অবস্থায় থাকে ।

কেউ যদি লুকিয়ে এই লীলা দেখে তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য । কেউ বলে বিশ্বরূপ দর্শন হয় বলে আর বেঁচে থাকার ইচ্ছে থাকেনা । কেউ বলে পাগল, কালা, বোবা ও অন্ধ হয়ে যায় । নানা লোকের নানা থিওরি হলেও আজ পর্যন্ত কেউ সুস্থ অবস্থায় বেঁচে ফেরেনি ।

বাঁকে বিহারীর রাসলীলা লুকিয়ে দেখে ফেলে গৈরিকের চঞ্চল ও যুবতী স্ত্রী আলেয়া । এবং সেও মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলো । তারপর থেকেই গৈরিক কেমন যেন অসাড় হয়েই বেঁচে আছে । বিদেশে ছিলো । বিয়ে করতে দেশে গিয়েছিলো । কাজেই বিদেশে ফিরে আসে । কিন্তু প্রাণহীন হয়ে আছে । জয়শীলের কাছে নিয়ে আসে ওর বন্ধুরা --

জয়শীল ওকে বলেন :: রহস্য কি আমি জানিনা । তবে আমার জীবন দেখার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে পরম পুরুষ, তা যেই রূপেই তাঁর অর্চনা করা হোক্ না কেন উনি কারো অনিষ্ট করেন না ।

রাসলীলা হয়ত আলোর খেলা । উচ্চস্তরের কোনো শক্তি যার স্পর্শ মানবদেহ নিতে অক্ষম । তাই লোকে সহ্য করতে পারেনা । হয়ত মহাজাগতিক কোনো রশ্মি এসে সন্ধ্যালগ্নে ঐ নিধিবনে পড়ে ।

বিশ্বরূপ দর্শনের অর্থ হয়ত জগতের যে আসল রূপ অর্থাৎ জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন, দেখে লোকে বুঝতে সক্ষম হয় যে এতদিন যার পেছনে দৌড়াচ্ছে তা আদতে কিছু আলোর খেলা ব্যাতীত কিছুই নয় । একদিন নিজেকেও ঐ আলোর ধারায় ডুবে যেতে হবে ! নিজের অস্তিত্ব ও ইগো আমাদের সবারই বড় মধুর সম্বল । কাজেই যেই মূহুর্তে লোকে দেখে যে সে আসলে এক সিনেমার চরিত্র, সিনেমার নাম রাসলীলা আর স্ক্রিন হল ঐ নিধিবন তখন হয়ত নিজের অস্তিত্ব হারানোর ভয়ে- লোকে ; হৃদস্পন্দনের থেমে যাওয়াতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে । এরকমও মানুষ নিশ্চয়ই আছেন যাঁরা ওখানে রাসলীলা দেখে মোক্ষ পেয়ে গেছেন । যার পেছনে আমরা ছুটছি তা আসলে সিনেমার মতন নকল । রিয়েলিটিতে তার কোনো অস্তিত্ব নেই । এই চাপ নিতে পারেনা বেশিরভাগ মানুষ । আর ঠিক তখনই হয়ত ঢলে পড়ে দৈহিক জড়তার কোলে ।

কাউন্সিলিং করে করে গৈরিককে সুস্থ করেন জয়শীল । আসলে গৈরিক ; না এই দুনিয়ার- না আকাশগঙ্গার মানুষ । ট্রান্সিশনে থেকে গিয়েছিলো । নববধূকে হারাবার সময়ে , শোকের চেয়েও বেশি সে অবাক হয়েছিলো এরকম আজব ঘটনার সম্মুখীন হয়ে । কাজেই ঐ অসাড় অবস্থা ।

জীবন আশ্চর্য এক জিনিস । তার স্পর্শ আমরা লুটেপুটে নিচ্ছি, প্রতিক্ষণে । আবার জীবনের আরেক সত্য আছে । বিজ্ঞান বলো, দর্শন বলো যাই বলো সেসব দিক্ থেকে দেখলে আমরা মহাবিশ্বের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক কণিকা । আমাদের আদতে কোনো অস্তিত্বই নেই । আকাশ , বাতাস কোনো কিছুতে কোনো কন্ট্রোল নেই । তবুও আমরা আছি । ভীষণভাবে আছি । এই দুই সত্যের টানাপোড়েনে অনেকে উন্মাদ হয়ে যায় । মেন্টাল ব্যালেন্স হারিয়ে যায় ।

পাইল্যান্ডের একটি প্রতীক চিহ্ন নাকি গরুড় । আমাদের গরুড় । বিদেশের বেশ কয়েকটি দেশে গরুড় গুরুত্ব পেয়েছে । সেই নিয়ে গবেষণা করতে ওখানে যায় শতদ্রু । একটি পাই মেয়েকে বিয়ে করে ।

পরে দুই সমাজের নিয়মকানুনের মাঝে আটকে গিয়ে দিশেহারা হয়ে যায় ।

আসলে ওর স্ত্রীকে নিয়ে, ওখানে দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ শুরু করে । ওখানে অনেক বিদেশী মানুষ গিয়ে থাকে ; অবসর জীবন যাপন করে । সুন্দর দেশ বলে ।

কিন্তু গরীবদের ; ওদের সরকার খুব খারাপভাবে রাখে । সমস্ত কিছু নির্বাচিত ও নির্ধারিত হয় ধনীদের কথা ভেবে । হয়ত তাই সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করা শতদ্রুকে নিয়ে সমস্যা শুরু হয় । ওকে স্থানীয় শক্তিশালী লোক বলে যে আমরা থাকতে তুমি বিদেশী ব্যাটা এখানে কোন সমাজ শুধরাতে এসেছো ? এটা কি ফাজলামো করার জায়গা ? দরিদ্রদের জন্য কাজ করা এত সহজ ? সরকারের কোনো দায়িত্ব নেই এই ব্যাপারে ? আমাদের মনে হয় যে তোমার সমাজ সেবা তোমার বাসায় শুরু হয় আর ওখানেই শেষ হয় । আমাদের মেয়েকে বিয়ে করে তুমি উদ্ধার করেছো নাকি ? তোমরা বিদেশীরা এসেই আমাদের সমাজ নষ্ট করছো বলে আমরা মনে করি ।

শতদ্রু আর কথা না বাড়িয়ে বিদেশে চলে এসেছে । ওর স্ত্রী এখানে মাসাজের কাজ করে । থাইল্যান্ডের মাসাজ চমৎকার । খুবই কোমলভাবে আরাম প্রদান করা হয় ; মাসাজের মাধ্যমে । কাজেই নতুন করে জীবন শুরু করে ওরা কিন্তু ঐ তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলতে পারেনি ।

লাইফ কোচ জয়শীলে শরণাপন্ন হয় পরে ।

জীবনে জাদুকাঠির ছোঁয়া লাগে ।

নানা মানুষের নানান সমস্যা ।

লোপামুদ্রার সমস্যা শুরু হয়ে পোষ্যের বিয়ে নিয়ে ।

ওর বাড়ির পোষা বিড়ালের বিয়ে সে স্থির করে অন্য পাড়ার এক বিড়ালিনীর সাথে । ওর চেনা , বিড়ালের পত্নীর মালিক !

সেই নিয়ে ঘোরতর আপত্তি ওর পড়শীর । তার জ্যান্ত , হৃষ্টপুষ্ট এক মেয়ে বিড়াল থাকতে কি করে লোপা অন্য পাড়ার বিড়ালিনীর বাড়িতে তত্ত্ব পাঠাচ্ছে তাই নিয়ে গোলমাল । হাতাহাতি চরমে উঠলে প্রাণ যায় লোপার স্বামী প্রবালের । বিধবা লোপা, সুস্থ সমাজে ফেরার জন্য এরপর থেকে যুদ্ধ করতে শুরু করে । আসলে বিশ্বাস ভেঙে গিয়েছিলো । সবাইকে খুনী মনে হত ।

পরে জয়শীলের রক্ষাকবচ পেয়ে সুখী এখন !!

জয়শীল বলেন :: আমি মানুষের মানসিক ইমিউনিটি বাড়িয়ে দিই । ফলে ওরা নিজেরাই পরবর্ত্তীকালে নিজের কল্যাণে কাজ করতে পারে । ওদের ভেতরে যে দীপ আছে আমি সেটা জ্বালিয়ে দিই । আর সেই আলোতে ওরা পথ চলে ।

কবিতা প্রামাণিক ; সাধারণ চাকুরে । তিনটে সন্তান । স্বামী পলাতক । আজ পনেরো বছর হল তার সন্ধান মেলেনি । বাচ্চাগুলিকে মানুষ করা , একা হাতে বেশ কঠিন । ওরা সবসময় জাঙ্ক ফুড কিনে খায় । টেক্ এওয়ে করতে পছন্দ করে । কিন্তু কবিতার উপায় নেই । দুটো চাকরি করার পরে রান্না করার সময় থাকেনা । বাচ্চাদের ; বাড়িতেই পড়াতে হয় ওকে । কাজেই ছুটির দিন ছাড়া রান্নার সময় নেই । ছুটিতেও ঘর পরিস্কার , জামাকাপড়ের পাহাড় কাচা ইত্যাদিতে সময় চলে যায় ।

তাই কবিতার মনে হয় যে একটা ভালো প্রেসার কুকার আর মাইক্রো ওয়েভ কিনলে ওর রান্না করতে সুবিধে হবে । কিন্তু এখনও কেনার মতন পয়সা যোগাড় হয়নি। বাচ্চাদের স্কুলে রোজই এটা সেটা করে করে অনেক টাকা দিতে হয় । আর হাতে এক্সট্রা কিছু থাকেনা । ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও মহাশুন্য ।

কাজেই তার স্বপ্ন হল প্রেসার কুকার ও মাইক্রো কেনা ।

ছেলেপুলেগুলো তখন বাসায় খাবে । জাঙ্ক ফুড খেয়ে খেয়ে আর পেটে পচন ধরাতে হবে না !

এই দু:খে সে কাহিল । বাচ্চারা অখাদ্য কুখাদ্য খাচ্ছে । স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে ।

চিতায় শায়িত জয়শীলের পার্থিব দেহ । বহু মানুষের ছাদ, জয়শীল কর্মকারের দেহে কিছুক্ষণের মধ্যেই অগ্নি সংযোজন করা হবে । পুড়ে ছাই হয়ে যাবে অস্তিত্ব !

বুক চাপড়ে কাঁদছে মানুষ । ক্রন্দন রত মানুষের দু:খে যেন আকাশও আজ মুখ ভার করেছে ।

এগিয়ে গেলো মেয়ে কোমল । বাবার চিতায় আগুন দিতে । মুখাগ্নি করতে । যেমনটা তার বাবা চেয়েছেন ! মেয়ে আগুন দেবে , দেহাংশে ।

কিন্তু আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গও দেখা গেলোনা । জ্বললো না আগুন ! চিতার কাঠগুলো দাঁত বার করে হাসছে । সমানে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু জ্বলছে না বহ্নিশিখা ! তবে কি শাস্ত্র মানা হচ্ছে না বলে , মেয়েকে দিয়ে মুখাগ্নি করানো হচ্ছে বলে এরকম হচ্ছে ? ধর্মে হয়ত সইছে না ! কে জানে ?

ঠিক এইসময়, চিতার কাছে দেখা গেলো এক জোড়া নারী, হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে । কোমল এগিয়ে এলো । এর মধ্যে একজন জয়শীলের প্রথম সন্তান যশোধরা আর অন্যজন তার স্ত্রী- নয়ন সাহা !

যেন একজোড়া গ্রেসি সিং ! গ্রেসির ওভারডোজ !

মাও ও মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে । মা , নয়ন সাহা কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে আর মেয়েও কাঁদছে অদেখা বাবার কথা মনে করে ! তাকে জানানো হলনা যে তাঁর আরো একটি মেয়ে আছে আর সেই-ই আসলে প্রথম সন্তান !

যশোধরার হাতে তুলে দিলো জ্বলন্ত কাঠ , কোমল । নাহ্! জ্বললো না চিতা !

তখন মানুষের মিছিলের মধ্যে থেকে অনেকেই বলে উঠলো নয়নকে :: আপনি একবার শেষ চেষ্টা করুন দেখি- তারপর নাহয় পুত্ররা আগুন দেবার চেষ্টা করবে, দাহকার্য সমাপ্ত করার জন্য !

নয়ন এগিয়ে গেলো । হাতে নেওয়া মুখাগ্নির শিখা !

এবং চিতা জ্বলে উঠলো !! একই সঙ্গে নিয়ম তৈরি ও ভঙ্গ হল লাইফ কোচের দাহ মহোৎসবে ! উৎসব নয় তো কী ? এত মানুষ , এত চোখের জল, প্রাণের টান

কি কেবল শোকের জন্য ? না । এও এক উৎসব । অন্য ধরণের ফাংশান ।

জয়শীল বলে গিয়েছেন যে তাঁর চিতায় আগুন দেবে কোনো নারী ! কিন্তু সে হবে তাঁরই সন্তান এরকম কিছু বলে যাননি ।

যে মানুষটি সবচেয়ে দুখী , তার কোনই ভূমিকা থাকবে না দাহকার্যে ? কেন এরকম আজব নিয়ম ?

স্ত্রীর গর্ভ থেকেই সন্তান জন্মায় । অথচ মৃত্যুর পরে বিবাহিতা স্ত্রী , স্বামীর মুখাগ্নি করেন না । গুড্‌বাই জানাবার এর চেয়ে উত্তম উপায় আর কী থাকতে পারে একজন পত্নীর কাছে ?

স্ত্রী তার সিঁদুর বা মঙ্গলসুত্র খুলে ফ্যালে কিন্তু পতিদেবের মৃতদেহকে আগুনে অর্পণ করেনা । **যেই দেহের সাথে, এত ভাব ছিলো তা থেকে আত্মা বিয়োজিত হতেই এত দূরত্ব ?**

ব্যাপারটা পছন্দ ছিলো না জয়শীলের । মুখ ফুটে বলে না গেলেও ; বুঝেছিলেন যে প্রথমা স্ত্রী নয়ন ওর ললাট লিখনের জন্যেই হয়ত জীবিত স্বামীর কাছ থেকে

দূরে চলে গেছে- তাঁর মৃতদেহে আগুন দিতে পেরে অনেকটা কষ্ট ভুলতে পারবে ।

সত্যি আজ তার আনন্দের অশ্রু ঝরছে- ত্রিনয়নে ।

দুনিয়ার আর কোনো কোণে, এইভাবে কোনো স্ত্রী তার স্বামীর দাহকার্য করছে কিনা জানেনা কোমল । বাবা অবশ্য বলেছেন যে প্রাচীন শাস্ত্রে ,পুত্রীরও অধিকার ছিলো দাহকার্যে অংশ নেবার কারণ আত্মার কোনো লিঙ্গ হয়না । পরে পার্থিব পুরুষেরা এই নিয়ম বদলে দেয় ।

অতশত শাস্ত্র, ধর্ম জানেনা কোমল । **শুধু জানে তার বাবার মৃত্যু আজ ইতিহাস হল- নয়ন মায়ের আনন্দাশ্রুর স্পর্শে ।**

আজব আবদার জয়শীলের ! এখানে আছে এক অদ্ভুত নদী । ডামডিং নদী । সেই নদীর জলে কেউ নামলে অসুখে পড়ে । এমন সব জীবাণু তাদের আক্রমণ করে যাদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই !

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন :: এই নদীর সৃষ্টি হয়েছে কোনো উল্কাপাতে ! তাই এখানে অন্যগ্রহের জীবাণু পাওয়া যায় ! যেসব মাইক্রো অর্গানিজম্ পার্থিব বাতাসে

বাড়তে সক্ষম , তারা কোটি কোটি হয়ে নদীর জলে বিরাজ করছে ।

ভয়ে সহজে কেউ ঐ নদীর কাছে যায়না !

হাত গলে যায় , লাল-নীল বমি করে , মাথার পেছনে হলোগ্রামের মতন চাঁদ লেগে থাকে ইত্যাদি । জয় কর্মা অর্থাৎ জয়শীল কর্মকার ; বলে গেছেন যে তাঁর চিতা ভস্ম যেন এই ডামডিং নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় । কারণ মৃত্যু মানে অন্যজগতে চলে যাওয়া । আবার আলোয় ফেরা । **আর সেই আলোর ঠিকানা- এই মহাজাগতিক বারিতে পরিপূর্ণ নদী ব্যাতীত আর কেই-ই বা দিতে পারবে ?**

ভীনগ্রহের জীবাণু যদিও বা এই নদীকে নরখাদক করেছে কিন্তু আত্মার কাছে সেই ভয়াবহতার কোনো অর্থ নেই । কাজেই অন্য ডায়মেনশানে যেতে হলে, উল্কাপাতে সৃষ্ট এক সুবিশাল গর্ত- যা কিনা এই নদীর জনক ; তার থেকে উপযুক্ত বৈতরণী আর হাতের কাছে নেই । **কাজেই তাঁর চিতাভস্ম যেন এই আশ্চর্য নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় ।।।**

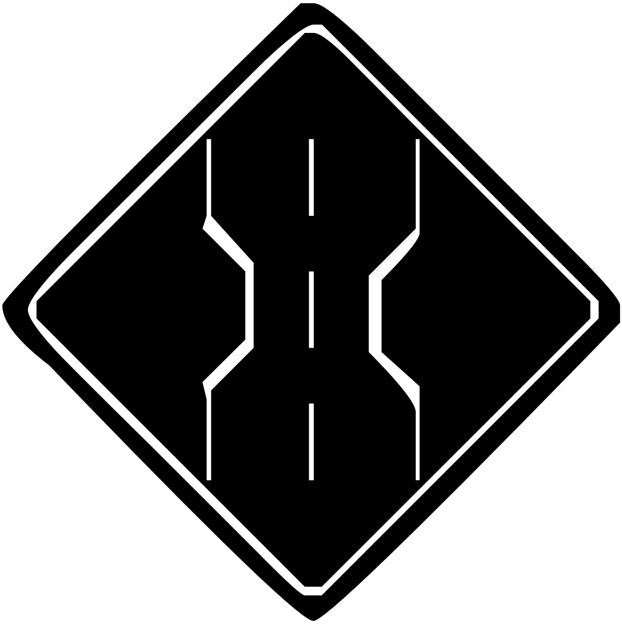

বিষুবরেখা

বাদামী খাঁজ কাটা পাহাড়ের সবুজ উপত্যকায় এক ফাঁকা মাঠের ওপরে ভাঙা বাড়ি । তার একদিকে নতুন দালান । সেখানে একফালি বদ্ধ ঘরে অল্প আলো । সামনের বারন্দায় মোটা আচ্ছাদন । জানালার কাঁচ বন্ধ । ঘরের বাইরে সদাব্যস্ত প্রহরী । টেলিফোন লাইন কাটা । ইন্টার্নেট বন্ধ । রান্না বান্না বাজার হাটের পাট নেই । নেই অতিথি আগমনের ঘটা । বেশির ভাগ সময়ই বাইরে থেকে খাবার আসে । রুটি , তড়কা , কাঁচা পেঁয়াজ , টক দই । অথবা মাটন কিংবা গোস্ত বিরিয়ানি ।

লায়লা খান । গৃহবন্দী সোসাল অ্যাক্টিভিস্ট । ৩৮ পেরোনো লায়লার মুখখানিতে এক অদ্ভুত সারল্য মাখানো, দেখে মনে হয় পাশের বাড়ির কোনো মেয়ে । গোলাপের পাপড়ির মতন রং , তুলতুলে দেহ , ঈষৎ চাপা নাক কিন্তু মুখে মিষ্টত্ব আছে । অনেকটা আমাদের বলিউড সুন্দরী মনিষা কৈরালার মতন দেখতে । প্রথম দর্শনে মনে হবে ইঁনি কোন অভিনেত্রী কিংবা কোন শিল্পীর Muse – কিন্তু নাহ্ ! ইঁনি আদতে একজন নারীবাদী , সমাজসেবিকা । ওঁনার সংগ্রাম মেয়েদের নিয়ে । ওঁনার সংগ্রাম সমাজে অবহেলিত , পতিত নারীদের নিয়ে । দুর্বলদের নিয়ে । অবশ্যই মেয়েদের উঁনি দুর্বল বলতে নারাজ ।

আজ উনি গৃহবন্দী। কারণটা কিছুই নয় সমাজে অত্যাচারিত মহিলাদের হয়ে উনি ইগোর দাস পুরুষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

তাই বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ওঁনাকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে। তাই উনি আপাতত: একটি শহরে পুলিশের নজরবন্দী হয়ে আছেন।

জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে ওঁনার। কোথাও যাবার উপায় নেই। কারো সঙ্গে দেখা করবার উপায় নেই , বন্ধুবান্ধব , আত্মীয়স্বজন সবাই হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। আছে শুধু একরাশ হতাশা , একাকীত্ব। নি:সঙ্গ , নিরালা লগ্ন। ভালো কাজের এই ফল ? এই শাস্তি ? ঈশ্বর ব্যাটা কোথায় এখন ?

লোনলিনেস যে এত ভয়াবহ আগে জানা ছিলনা। কারণ আগে কোনদিন একা কাটাতেই হয়নি ! প্রথমে পড়াশোনা , তারপর চাকরি , তারও পরে নিজের কর্মজীবন থেকে স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে এন জি ও খুলে জনহিতকর কাজ ,সব সময়ই সময়ের টান পড়তো। মনে হত দিনটা ৪৮ ঘন্টার হলে বড়ই ভালো হত। আর আজ মনে হয় দিনটা কি ভীষণ লম্বা ! ঘড়ির কাঁটা যেন নড়েই না। একা একা বসে সময় কাটায় লায়লা। মনে হয় তার যে সংগ্রাম সেটা কি কোনো ভুল পদক্ষেপ ? অনেকেই বলেছিল তাকে ক্ষমা চেয়ে নিতে। কিন্তু সে রাজি হয়নি। রাজি হয়নি আরো একটা নরকের কীট পুরুষ ইমরানের কাছে মাথা

নোয়াতে। জনকপুরের রুলিং পার্টির নেতা ইমরানের পুত্র গাপ্পা প্রথমে লোকজন জুটিয়ে আরম্ভ করে ঝামেলা। অভিযোগ , লায়লা রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত। রাজনীতির প্যাঁচে লায়লা পর্যদস্তু। যখন ষড়যন্ত্র বাড়লো লায়লা বিদেশে পলায়ন করলো। ওর প্রথম স্বামী হামিদ ওকে আগেই ছেড়েছিল। হ্যাঁ ,বলা হয়নি এই লায়লা সেই ইতিহাসের লায়লা নয়। এক ভিন্ন চরিত্র। তাই এর জীবনে অনেক মজনু। তো প্রথম মজনু কেটে পড়েছিল এর লড়াই করবার অ্যাটিটিউড দেখে। মেয়েরা হবে নরম সরম , সুকোমল , পুরুষের এক আঙুলের ইশারায় উঠবে , বসবে , নাচবে , গাইবে। তা নয় এ লড়াই করে হিউমান রাইটস্ নিয়ে। ভরা বাজারে গলা ফাটিয়ে মাইকে সমতার বুলি কপচায় , বলে : নারী পুরুষ সমান , সমান। আমি এই ধরিত্রীর বুকে মানবজাতির ওপর একটি বিষুবরেখা টানতে চাই ! ছেলেও মানুষ , মেয়েও মানুষ --শুধু মেয়েমানুষ নয় তারা।

বিদেশ থেকে এক আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে লুকিয়ে এসেছিল সে পড়শী দেশে। তারপর রয়ে গেছে সেখানেই। আলাপ হয়েছে বিনোদের সঙ্গে। এক অভিজাত পাবে। বিনোদ কর্পোরেটদের মেয়ে সাপ্লাইয়ের মহৎ কাজ করতো। নিজে বিয়ে করেনি। দাবী করে সে ভার্জিন পুরুষ। হতেও পারে , লায়লার মনে হয় হতেও পারে।

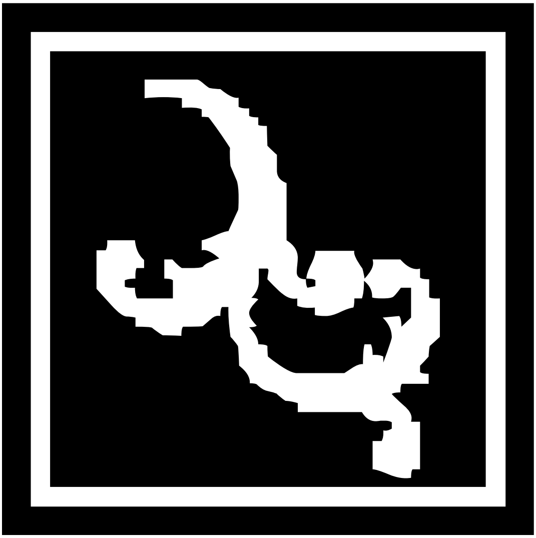

মার্চের শেষে হিমালয়ে একটি রাত । বসন্তের আগমনে গাছে গাছে পাতায় পাতায় অভিসারের ডাক । বিনসরের মহীন্দ্রার কটেজে আলিঙ্গনে আবদ্ধ দুটি প্রাণ । নগ্নিকার গোলাপী ঠোঁটে দীর্ঘচুম্বন এঁকে দেয় সঙ্গী পুরুষ । তারপর স্তনের আগায় আলতো চাপ -- এই সুড়সুড়ি লাগছে বিনোদ ! কি করছো ? কতবার না বলেছি পুরো বুকটা ধরে টিপবে , আরাম লাগে, তা নয় বোঁটায় আঙুল বুলানো , বুলালে সুড়সুড় করে যে !

- আমি সেক্সের বইতে পড়েছি ডার্লিং হাউ টু এনজয় সেক্স ।
- সব কথা বইতে লেখা থাকেনা বিনস্ , আমার তো একটা আরামের ব্যাপার আছে নাকি ? ডু ইউ ওয়ানা স্যাটিসফাই মি অর নট ?
- হ্যাঁ, লালি আমি তো আনকোরা , তুমি অভিজ্ঞ , তোমার তো এটা দ্বিতীয় । বিনোদ অপরাধী অপরাধী মুখ করে বলে । লায়লা ওরফে লালি হাসে , মনে মনে বলে দ্বিতীয় সেটা তুমি জানো কারণ ব্যাচমেট সুহাসের সঙ্গে নিভৃত দিনযাপন কিংবা জাভেদ স্যারের আগুনে পোড়া পত্নীর শারীরিক সম্পর্ক না

করতে পারার অভাব মেটাতে তার সঙ্গে যৌনক্রীড়া-
-এগুলো তো তুমি জানোনা গো , ভালোমানুষের পো
আমার !

সেই বিনোদের সঙ্গেও সম্পর্কটা চুকে গেলো একদিনে । সামান্য ঝগড়ার জন্য । পরিণত বয়সের মানুষেরা নাকি ঝগড়া করেনা , মতের আদান প্রদান করে, কোথায় যেন পড়েছিল লায়লা । কিন্তু বিনোদকে দেখলে সেটা মনে হবেনা । খুব রেগে যেত ও মাঝে মাঝে , হয়ত মেল ইগোতে আঘাত লাগলে । সেদিন তর্কটা শুরু হয়েছিল এই নিয়ে যে কার প্রয়োজনীয়তা বেশি ? নারী নাকি পুরুষ ।

লায়লা যুক্তিবাদিনী । তার যুক্তি , সোমাটিক সেল থেকেও অফস্প্রিং জন্মাতে পারে -- curvaceous country western singer ডলি পার্টনের বাস্টলাইন দেখে যে ভেড়ার নামকরণ করা হয়েছিল ডলি -সেই তার প্রমাণ । কাজেই পুরুষ জুতোর বুরুশ ব্যতীত কিছুই নয় । সাফ করলে ভালো , নাহলেও কিছুই যায় আসে না ।

তুমুল বাক্‌বিতন্ডা এবং ছাড়াছাড়ি । লায়লারও তো একটা ফিমেল ইগো আছে কিনা ? কিছুদিন ঘুরঘুর করেছিল , লায়লা পাত্তা দেয়নি । চিটেগুড়ের মতন চ্যাটচ্যাটে পুরুষ গুলো । ঘেন্না হয় । তবুও দেহের তো একটা চাহিদা আছে ! ব্যাটা ভগবান না কে যেন এইসব নিয়ম চালু করেছে । যত্তসব । নারীদের একবারে মেরে দিয়েছে গা ? ভগবান ব্যাটাও তো ছেলে !

তৃতীয় পুরুষ সলমন   । লায়লার সিকিউরিটি । ততদিনে লায়লা মেয়েদের , শিশুদের রাইটস্ নিয়ে হৈ চৈ বাধিয়ে বেশ বিখ্যাত । কয়েকবার রাজনৈতিক হামলাও হয়েছে । মাথায় লাঠির আঘাতে বেশ কিছুদিন হাসপাতালের বিছানায় বেহুঁশ পড়েছিল । তারপর নিরাপত্তার ব্যবস্থা হল । সেই নিরাপত্তা কর্মীর সঙ্গেই সেক্স । লায়লা ছোটবেলা থেকেই একটু কামুক । গড়পরতা বাদামী ,সহনশীলা নারীদের মতন নয় । বান্ধবীদের বলতো --আমার স্বামী যদি আমার যৌনক্ষুধা মেটাতে না পারে, আমি অন্য পুরুষে যাবো । ছেলেরা তো যায় , আমরা গেলেই দোষ ? আমি সোনাগাছির মতন রূপাগাছি খুলবো তখন ।

দীর্ঘদিন যৌনজীবন যাপনে অসমর্থ লায়লা বেছে নিয়েছিল সুপুরুষ সলমনকে । ঘরের ভেতরে ক্লিভেজ বার করা পোশাকে- লায়লার সলমনকে বশ করতে বেশি সময় লাগেনি । চলতো অবসরে সঙ্গম । লায়লা আক্ষরিক অর্থেই রক্ষিতা তখন । পুরোপুরি গচ্ছিত সলমনের কাছে । সলমন নিজে উদোম হয়ে লায়লাকে উদোম করতো । বলতো , তোমাকে সবসময় ল্যাংটো করে রাখবো মেরি জান ! দুনিয়া জানবে না যে পুরুষ বিদ্বেষী , বীরঙ্গনা লায়লা সুন্দরী এই বডিগার্ডের কাছে পুরোপুরি কেল্লো । লায়লা সলমনে সমর্পিতা হয়েও মনে মনে হেসেছিল সেদিন ।

লায়লার অনাবৃত, অভিমানী কৃষ্ণ বদ্বীপে অঙ্গুলি সঞ্চালনের সময় সলমন কিঞ্চিৎ অমনোযোগী হয়ে বললো --

তুমি আমাকে ভালোবাসো লাইলি , লাভলি ডিয়ার ?

--নাহলে সব দিলাম কি করে সাল্লু ? মিষ্টি বক্র হাসি লায়লার মুখে ।

মনে মনে অবশ্য বলে একদম ভিন্ন কথা ।

পুরুষ কি ভালোবাসার যোগ্য ? তোরা শালা ঘেয়ো কুত্তার জাত। মেয়েদের পেছন কিছুতেই ছাড়িস না ! তোদের বিয়ে হোক না হোক তোরা বুনো পশুর মতন হিংস্রভাবে নারীকে গিলে খেতে আসিস। আমাকে যে সে নারী পাসনি। মূর্খ পুরুষ ! তোকে ভোগ করে তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিতে আমার বিন্দুমাত্র সময় লাগবে না !

দিলোও তো। কিছুদিনের মধ্যেই সলমনের বদলী করালো অটোগ্রাফের খাতায় অভ্যস্ত , রূপসী সমাজসেবিকা , সেলিব্রিটি লায়লা। পাহারায় গাফিলতির অভিযোগে। যার হাতটা ধরার জন্য লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত মহিলা অগ্রহী। গ্রামে গঞ্জে , হাটে বাটে।

স্বামী ধরে ঠ্যাঙায় , মদ্যপ স্বামী অত্যাচার করে , সফটওয়্যার ইঞ্জিনীয়ার বিয়ে করে -মোটা পণের জন্য বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছে , এম এন সির- ভাইস প্রেসিডেন্ট বৌকে ঘরে রেখে ফার্মহাউজে অন্য নারীর সঙ্গে রতিক্রিয়া রত , বৌ কার কাছে যাবেন ?কেন লায়লা খান !

সমস্ত অরাজকতা ভেঙেচুরে এক ডান্ডায় খান খান , লায়লা খান।

পুরুষকে, শোলে এস্টাইলে -অনেক নারীকূল ভয় দেখাতো--- সো যা চুপ চাপ আদমি , লায়লা গব্বর আ রহি হ্যায়।

সেই নজরবন্দী লায়লা খান একদিন পালালো । পালালো সিউকিউরিটি কে কাঁচকলা দেখিয়ে । বোরখা পরে পলায়ন করলেও পরে সে হল এক মুক্ত নারী । বদ্ধ ঘরের চারদেওয়াল থেকে মুক্ত হয়ে বিহঙ্গের মতন ডানা মেললো সুনীল আকাশে । পালিয়ে চলে এলো ওর নিজের দেশে । যেখানে ওর প্রবেশ নিষেধ ছিল ঐ রাজনৈতিক দলের সদস্যদের জন্য , যারা ওর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনেছিল । কিন্তু আশ্চর্য ! কেউ ওকে ছুঁলো না , কাছেও এলো না । মারা তো দূরের কথা । যেই পার্টির কর্মীরা ওর শিরের দাম ধার্য করেছিল ১০ লক্ষ টাকা তারা সবাই সুড়সুড় করে পালিয়ে গেলো ওকে দেখেই ।

লায়লা এখন মুক্ত পরী । লায়লা নিজের সব প্রিয় প্রিয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখে । লায়লা বাঁশমতী নদীর তীরে বসে তাজা বাতাসে নি:শ্বাস নেয় ।

কফিহাউজে যায় , আড্ডা দিতে কিন্তু ডাক্তার পরভেজ আলি ব্যতীত কেউ হ্যান্ডশেকও করেনা । সবাই দূরে দুরে থাকে । যাকে ধরার জন্য এত হম্বিতম্বি সে আজ ঘুরে বেড়াচ্ছে ইতিউতি কিন্তু কেউ ফিরেও চাইছে না ।

কাজকম্মো বন্ধ হয়ে গেছে সে তো অনেকদিন । লায়লা কিন্তু প্রকৃতির কোলে হেসে খেলে দিন কাটাচ্ছে । অনেক হালকা সে আগের চেয়ে । বদ্ধ ঘরের দম বন্ধ হয়ে আসা পরিবেশ থেকে এই ঢের ভালো । অন্তত: যে কটা দিন আর বাঁচে ।

মড়ার ওপর খাড়ার ঘা মেরে লাভ নেই । বিরোধীরা তাই সরে গেছে । অনুরাগীরা সরে গেছে ভয়ে । শরীরটা খারাপ হতে শুরু করেছিল হঠাৎই । তারপর হাসপাতাল , নানান পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অবশেষে এই সিদ্ধান্ত ।

ড্রাগসের সূঁচ থেকে নাকি কোন পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে অসতর্ক যৌন মিলনে জানা নেই লায়লার , ভয়ানক অসুখ এইডস এসে বাসা বেঁধেছে তার শরীরে । এখন শুধু শেষের সে -দিনের অপেক্ষা । আজ কেউ তাকে খোঁজে না , কেউ ওর সন্ধানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে না । তবুও আজ মুক্ত হয়েও সে বন্দী , রক্তরোগের কারাগারে । বিষ সঞ্চার হয়েছে তার দেহে । ছেয়ে গেছে সমস্ত সত্তায় । যাদের জন্য সে জীবনপণ করে এতো লড়াই করলো , আজ তারাই তাকে এড়িয়ে চলেছে শুধুমাত্র রোগের ভয়ে । নিজেদের জীবন রক্ষার ভয়ে । আর বিরোধীরা আজ তাকে করুণা করছে ।

নারী স্বাধীনতার অর্থ বোধহয় স্বেচ্ছাচারিতা নয় । কুসুম তো স্বামীর ওপর নির্ভরশীল । তবুও দুটিতে খুবই খুশী । কুসুমের কোন অভিযোগ নেই স্বামীর প্রতি আর নারীবাদীদের সম্বন্ধেও সে আগ্রহী নয় । আবার পরভীন , ও তো বেরিয়ে এসেছিল মৌলবাদীদের করালগ্রাস থেকে । কিন্তু ও নিজেই আজকাল বলে যে -প্রতিটি পদক্ষেপে ওকে সমাজে, পুরুষের এতটাই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় যে আজ ও স্বাধীন হয়েও পরাধীন । ওর কাছে নারী স্বাধীনতার কোন অর্থই নেই আজ ।

লায়লা আজ বুঝতে পারে পতির রোজগারে নির্ভর করেও একজন নারী স্বাধীন হতে পারেন । আবার বহু পুরুষের বাহুলগ্না হয়েও পরাধীনতার শৃংখল বেষ্টিত হতে পারেন নারী । সবটাই নির্ভর করে নারীর পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও কি ধরণের মানুষ দ্বারা সে বেষ্টিত তার ওপর ।

পুরুষের সাহায্য না পেলে কি নারী প্রথম বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারতো ? সেও তো কোন পুরুষই ছিল ! আর সব পুরুষ রেপিস্ট হলে এই

২০০৭ এও কি মেয়েরা বাইরে কাজ করতে পারতো ?

রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, নেতাজী, রাসবিহারী বোস ,রাণাপ্রতাপের বাবা-যাঁর প্রশ্রয়ে তাঁর মা --- রাজপুত রাণী ,নিজ স্বামীকে রাজ্যপাটে সাহায্য করতেন - সবাই তো পুরুষ । আর সমস্ত ছেলেরা শয়তান ও লম্পট হলে এইভাবে মেয়েরা দলে দলে বাড়ির বাইরে আসতে পারতো ? পারতো না । বুদ্ধিমতী লায়লা, আসলে যশস্বিনী হবার সস্তা একটা রাস্তা চেয়েছিলো । চালিয়াতি করে বা না নেকিয়ে অন্য একটা পথ ধরেছিলো । অ্যাগ্রেসানের পথ এই আর কি !

আসলে পরাধীনতা নারীর হয়না , হয় বোধহয় চিন্তাধারার । চিন্তাধারা স্বচ্ছ ও সুন্দর হলে বাড়ির মধ্য থেকেও সে নারী হতে পারেন স্বাধীন ! নাই বা বুক খোলা জামা পরে, পুরুষ বেষ্টিত হয়ে গেলেন রং চঙে পার্টিতে । নাই বা করলেন কোকেন , সিগার , সুরাপান !

মানুষকে মানুষের সম্মানটা দিলে সমাজও একদিন তাকে স্বীকৃতি দেবে অন্তত: ভালোমানুষ হিসেবে। ভালোমানুষ হওয়া ও আনন্দে থাকা এই তো জীবনের লক্ষ্য !

সে তো আজ দেখছে একমুঠো আনন্দকে সে কেমন লুটেপুটে নিচ্ছে , বহুদিন পরে খোলা নীল আকাশের নীচে ! খোলা পোশাকের চেয়ে খোলা নীল আকাশই তাকে সুখ দিচ্ছে।

বেদান্তে পড়েছিল যে এই দুনিয়ার সব জীব - এক ও অবিচ্ছেদ্য এবং গোটা সভ্যতাটাই একটা সংসার - বসুধৈব কুটুম্বকম্ । মানবদরদী কমিউনিস্টরাও তো একই দর্শন প্রচার করেন। মানুষের বেসিক রাইটস্ নিয়ে বলেন , লড়াই করেন, জনচেতনা বাড়ান। সবাই ফুড, শেল্টার আর ক্লথিং এর দিক থেকে সমান। তাদের মধ্যেও সবাই স্বেচ্ছাচারী নন। লম্পট নন। চে গুয়েভারা , ফিদেল কাস্ত্রো , ট্রটস্কি এঁরাও তো পুরুষ।

বাংলার বাঘ-- স্যার আশুতোষ মুখার্জি , লৌহমানব বল্লভভাই পাটেল , শচীন ও বিজয় তেন্ডুলকার সবাই তো পুরুষ !

রিয়ালিটি হল ----বাস্তবে সমতা আনা বড় সহজ কথা নয়, আনা যায় কি ? অসমতা না ভেবে যদি সেটাকেই সমতার ভিন্ন রূপ বলে ভাবা হয় ? পদ্ম যেমন সুন্দর, ক্যাকটাসের সৌন্দর্য্য নিজ শুষ্কতায়।
বসরার গোলাপ অথবা ডুবাইয়ের ক্যাকটাস্- আপন ভুবনে মাধুরী ঝরায়।

গোলাপের,ক্যাকটাস হতে চাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এক ধরণের হীনম্মন্যতা। কিন্তু গোলাপ কী চায় তা কি মানুষ বোঝে ? মানুষ শুধু নিজের ধারণা গোলাপের ওপরে চাপাতে জানে।

প্রকৃতি দাগটা টেনে দেয়নি তাই তাত্ত্বিকেরা বিষুবরেখাটা কল্পনাই করেন , সত্যিই ওটার কোন অস্তিত্ব নেই।

রাইকিশোরী

জানুয়ারি মাসেও কলকাতার অসম্ভব গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত রাইমার । বয়স প্রায় পঁচিশের কাছাকাছি , এলোচুল , টিকলো নাক অনেকটা মৃতা অভিনেত্রী মহুয়া রায়চৌধুরীর মতন দেখতে । সুন্দরী বলে একটু দেমাকও রয়েছে ওর । মেয়েটি অন্তর্মুখী । তাই দিনের অনেকটা সময়ই কাটায় নেটে বসে । বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা নেহাত-ই মন্দ নয় । সবাই ভার্চুয়াল বন্ধু । কেউ কেউ লুক্কায়িত , শুধু বৈদ্যুতিক তরঙ্গে জীবন্ত । কেউ কেউ বাস্তবে নেমে আসে । তেমনই এক বন্ধু সজল পান । নামটাই প্রথম আকর্ষণ করে রাইমাকে ।

রাইমার নাম ত্রিপুরার নদীর নামে । রাইমা আর সাইমা নদীযুগল ত্রিপুরার চিরসাথী । তার বাবা ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের সার্ভেয়ার । জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে ঐ রাজ্যে । পরে কলকাতার বেহালায় এসে বাড়ি কিনেছেন । এখন ওরা ওখানেই বসবাস করে । সজলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা দুজনে এক স্বর্ণালী সন্ধ্যায় বেড়াতে গেলো ভূটানঘাট । ডুয়ার্সের এই এলাকা বড়ই মনোরম । আগে থেকে বুক করা বনবাংলোতে এসে উঠলো দুজনে । এই প্রথম দেখা তো ! খুব সেজে এসেছিলো রাইমা ।

এমনিতেই সুন্দরী , চটকদার তার ওপরে সাজসজ্জা করে একেবারে রাজকুমারীটি ।

কিন্তু মিলন সমুদ্রের ঢেউ মনে এক আলোড়ন তোলে । যার কোনো সীমারেখা নেই । জ্বালা , তীব্র বিষের জ্বালা ! সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে খানখান ! দহন , দহনে টালমাটাল স্বপ্নের ভূটানঘাট ।

রাইমার রাজপুরুষ এক বৃদ্ধ । বয়স আন্দাজ ৫৫ । নাতিদীর্ঘ , থলথলে ভাব চেহারায় । দেখে মনেই হয়না ইনি লিখতে পারেন এত সুন্দর সুন্দর ই-চিঠি !

ভেঙে পরে রাইমা । মনের কষ্ট মনেই চেপে রাখে । সপ্তাহ-খানেক পরেও বাড়ি না ফেরায় পুলিশে খবর যায় । তদন্তে জানা যায় ভূটানঘাটের এক বনবাংলোয় তাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে । পোড়ানোর আগে ছোট ছোট পিস করে ফেলা হয়েছিলো ।

বনবাংলোর ম্যানেজার জানান যে ঘটনার পরদিন রাতে এক বৃদ্ধ পর্যটক ,হঠাৎ তার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বনবাংলোর বাগানে পার্টি দেন । সেখানে মদের ফোয়ারার সঙ্গে সঙ্গে আনলিমিটেড্ কাবাবের আয়োজন ছিল । এত কাবাব উনি কোথায় পেলেন কেউ জানেনা । অর্ডার দিয়ে বাইরে থেকে আনিয়ে ছিলেন ভেবেছিলো সবাই ।

আর কাবাবের স্বাদ ছিলো অদ্ভূত সুন্দর । শোনা যায় নরমাংস খুবই সুস্বাদু ।

শেষ

the end